Reg. No C. 534

ভাদ্র ৫ম সংখ্যা

হিন্দু-পত্রিকা।

WITH WHICH IS INCORPORATED "THE BRAHMACHARIN."

(ধর্ম্ম-সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা)



সম্পাদক

বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্,

সহকারি-সম্পাদক

স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী।

যশোহর

হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে

ইং—১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯২১।

বাং—২৯শে ভাদ্র ১৩২৮।

শকাব্দাঃ ১৮৪৩।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাকমাশুল ২৲ মাত্র, এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমানসংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, ব্রহ্মচারী আনন্দ চৈতন্য, শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, শ্রীমতিলাল দাস, শ্রীদুর্গাচরণ দাসগুপ্ত, আদ্যনাথ বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ, শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, ইত্যাদি।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টারীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৮ বর্ষ, ২৮শ খণ্ড
৫ম সংখ্যা।

ভাদ্র।

১৩২৮ সাল।
১৮৪৩ শকাব্দা

প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকম্।

প্রথমাঙ্কঃ।

মধ্যাহ্নার্কমরীচিকাস্বিব পয়ঃপূরো যদজ্ঞানতঃ।
খং বায়ুর্জ্বলনো জলং ক্ষিতিরিতি ত্রৈলোক্যমুন্মীলতি॥
যত্তত্ত্বং বিদুষাং নিমীলতি পুনঃ স্রগ্ভোগিভোগোপমং।
সান্দ্রানন্দমুপাস্মহে তদমলং স্বাত্মাববোধং মহঃ॥ ১॥

অপিচ,-

অন্তর্নাড়ীনিয়মিতমরুল্লঙ্ঘিতব্রহ্মরন্ধ্রং।
স্বান্তে শান্তিপ্রণয়িনি সমুন্মীলদানন্দসান্দ্রম্॥
প্রত্যগ্জ্যোতির্জয়তি যমিনঃ স্পষ্টলালাটনেত্র-
ব্যাজব্যক্তীকৃতমিব জগদ্ব্যাপিচন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ॥

যাহার অভাবে হায়
পঞ্চাত্মকবিশ্বোদয়

মরীচিকায় জলভ্রমপ্রায়।
পুনঃ যার জ্ঞান হ'লে
এই বিশ্ব যায় চলে
স্ফুটালোকে মাল্যসর্পপ্রায়॥
সেই আত্মজ্ঞানজ্যোতিঃ
ভাস্বর নির্ম্মল অতি
উপাসনা করি ভক্তি ভরে।
প্রগাঢ় আনন্দময়
যাহার স্বরূপ হয়
যোগিগণ যাহা ধ্যান করে॥
যোগিশ্রেষ্ঠশঙ্করের ভালনেত্রছলে।
বিশ্বব্যাপিব্রহ্মজ্যোতি-লোকে যাহে বলে॥
সুষুম্নার মধ্যে বায়ু নিগমন কলে।
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি যাহা হায়। যোগবলে॥
সুরসাম্পদ চিত্তে হইয়া উদয়।
করে যাহা যোগিচিত্ত সান্দ্রানন্দময়॥
সে ব্রহ্মজ্যোতির হোক নিরন্তর জয়।
যার ধ্যানে দ্বৈতভ্রম শীঘ্র হয় লয়॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ। অলমতিবিস্তরেণ। আদিষ্টোঽস্মি সকলসামন্তচূড়ামণিমরীচিমঞ্জরীনীরাজিতচরণকমলেন বলবদরিনিবহদক্ষকুটকবাটপাটনপ্রকটিতনরসিংহরূপেণ প্রবলতরনরপতিকুলপ্রলয়মহার্ণবমগ্নমেদিনীসমুদ্ধরণমহাবরাহেণ নিখিলদিগ্বিলাসিনীকর্ণপূরীকৃতকীর্ত্তিপল্লবেন, সমস্তাশান্তস্মেরমকর্ণতালাস্ফালনবহুলতরপবনসম্পাতনর্ত্তিতপ্রতাপানলেন, শ্রীমতা গোপালেন যথা খল্বস্মৎসহজসুহৃদোরাজ্ঞঃকীর্ত্তিবর্ম্মদেবস্য দিগ্বিজয়ব্যাপারান্তরিতপরমব্রহ্মানন্দৈরস্মাভিঃ সমুন্মীলিতবিবিধবিষয়রসদূষিতা ইবাতিবাহিতাদিবসা ইদানীমকৃতকৃত্যাবয়ং যতঃ,—

নীতাঃক্ষয়ং ক্ষিতিভুজো নৃপতের্বিপক্ষা
রক্ষাবতী ক্ষিতিরভূৎ প্রথিতৈরমাত্যৈঃ
সাম্রাজ্যমস্যবিহিতং ক্ষিতিপালমৌলি—
মালার্চ্চিতং ভুবি পয়োনিধিমেখলায়াম্॥

(নান্দীঅন্তে সূত্রধার) থাক্ আর বেশী বাড়াবাড়িতে কাজ নাই যাঁর চরণকমল সমস্তসামন্তনৃপতিগণের মুকুটমণির আভায় বিরাজিত হচ্ছে, যিনি প্রবল অরিসকলের বক্ষঃস্থল বিদারণ কর্ত্তে নৃসিংহরূপ ধারণ করেছেন, এবং যিনি প্রবলতরবিপক্ষরাজকুলরূপ মহাসমুদ্রে নিমগ্ন মেদিনী উদ্ধার কর্ত্তে বরাহরূপ ধারণ করেছেন, যাহার কীর্ত্তিপল্লব নিখিলদিক্‌বিলাসিনী-গণ কর্ণালঙ্কার করেছে, সমস্ত দিগ্‌গজগণের কর্ণতালাস্ফালনজনিতপ্রবলতর পবনভরে যাঁর প্রতাপানল নৃত্য কচ্ছে, সেই গোপালদেব আমাকে আদেশ করেছেন যে, সহজসুহৃদ রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মদেবের দিগ্বিজয়ব্যাপারে এতদিন আমরা ব্রহ্মানন্দরসে বঞ্চিত ছিলাম। হায়! হায়! বিবিধবিষয়রসে এই দিবসগুলি একান্তই দূষিতরূপে অতিবাহিত হইয়াছে এখন আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি—

হ'য়েছে বিপক্ষ নৃপগণে পরাজয়।
রক্ষিতেছে ভূমণ্ডলসম্প্রতিনিচয়॥
সাম্রাজ্য—নৃপতি মৌলিমালায় অর্চ্চিত।
পয়োধিনেখলা ভূমি হ'য়েছে স্থাপিত॥

তদ্বয়ং শান্তিরসপ্রয়োগাভিনয়েনাত্মানং বিনোদয়িতুমিচ্ছামঃ। তদ্‌যদপূর্ব্ব মত্রভবদ্ভিঃ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রেঃ প্রবোধচন্দ্রোদয়নামনাটকমভিনির্ম্মায় ভবতে সমর্পিত-মাসীৎ তদদ্য শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মণঃ পুরস্তাদভিনেতব্যং ভবতা। অস্তিচাস্য নৃপতেঃ সপরিষদস্তদালোকনকুতূহলমিতি, তদ্‌গৃহং গত্বা গৃহিণীমাহূয় সঙ্গীতমবতারয়ামি (পরিক্রম্য নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) আর্য্যে! ইতস্তাবৎ।

অতএব এখন আমরা কোনও একটী শান্তিরসপ্রয়োগ অভিনয়দ্বারা আত্মবিনোদন কর্ত্তে ইচ্ছা করি। মাননীয় শ্রীকৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক একখানা অপূর্ব্বনাটক নির্ম্মাণ করে আপনার হাতে দিয়েছেন তাই অগ্রে মহারাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার সম্মুখে অভিনয় কর্ত্তে হবে। সপারিষদ মহারাজের ঐ নাটক অভিনয় দর্শন কর্ত্তে বিশেষকৌতুহল আছে। সুতরাং এখন ঘরে যাই গৃহিণীকে ডেকে এনে সঙ্গীতের অবতারণা করি (নেপথ্যাভিমুখে করিয়া) আর্য্যে! এদিকে এস,

প্রবিশ্যনটী। অজ্জ! ইঅহ্মি আণবেদু অজ্জো কো নিওও অনুচিট্ঠী *

* আর্য্য! ইয়মস্মি আজ্ঞাপয়তু আর্য্যঃ কোনিয়োগোঽনুষ্ঠীয়তামিতি সং।

নটীর প্রবেশ—

নটী। আর্য্য! এই যে আমি, কি নিয়োগ অনুষ্ঠান কর্ত্তে হবে আদেশ করুণ।

সূত্র। আর্য্যে! বিদিতমেব ভবত্যা।

অস্তিপ্রত্যর্থিপৃথ্বীপতিবিপুলবলারণ্যমূর্চ্ছৎপ্রতাপ-
জ্যোতির্জ্জালাবলীঢ়ত্রিভুবনবিবরো বিশ্ববিশ্রান্তকীর্ত্তিঃ।
গোপালো ভূমিপালান্‌প্রসভমসিলতামাত্রমিত্রেণ জিত্বা
সাম্রাজ্যেকীর্ত্তিবর্ম্মা নরপতিতিলকো যেনভূয়োঽভ্যষেচি

অপিচ।

অদ্যাপ্যুন্মদযাতুধানতরুণীচঞ্চৎকরাস্ফালন—
ব্যাবল্‌গন্নৃকপালতালরণিতৈর্নৃত্যৎপিশাচাঙ্গনাঃ
উদ্‌গায়ন্তি যশাংসি যস্য বিততৈর্নাদৈঃ প্রচণ্ডানিল-
প্রক্ষুভ্যৎকরিকুম্ভকূটকুহরব্যাক্তৈরণক্ষৌণয়ঃ॥

সূত্র। আর্য্যে! তোমার ত জানাই আছে যে;—

বিপক্ষনৃপতিসৈন্য অরণ্যেমূর্চ্ছিত
স্বকীয় প্রতাপানলে—ঘোরজ্বালাময়।
ত্রিভুবনবিবরযিনি মহাকীর্ত্তিশালী
করেছেন পূর্ণ হায়! নিজবাহুবলে
একমাত্র অসিলতা করিয়া সহায়
দম্ভে দলি ভূমিপালগণ অনায়াসে
অভিষিক্ত করেছেন কীর্ত্তিবর্ম্মনৃপে
নরপতি কুলের তিলক ভূমণ্ডলে।
উন্মত্ত হইয়া যথা পিশাচ অঙ্গনা
করিতেছে নৃত্য হায় দিবসরজনী
উন্মত্তরাক্ষসীকর তাড়নে চঞ্চল
নৃকপাল তালসহ সেই রণভূমি
গাহিতেছে যশোরাশি যাঁর অদ্যাবধি
করিকুম্ভকুহরেতে প্রবিষ্ট প্রচণ্ড
পবন সম্পাৎধ্বনি ছলে অবিরত।

সার্থক গোপাল নামা রাজ সেনাপতি
বিপ্রকুলচূড়ামণি ধার্ম্মিক সুধীর ॥

তেনচ শান্তরস প্রস্থিতেনাত্মনো বিনোদার্থং প্রবোধ—
চন্দ্রোদয়ং নামনাটকমভিনেতুমাদিষ্টোঽস্মি
তদাদিশ্যন্তাং ভবত্যা নর্ত্তকপরিগ্রহায়।

তিনি এখন শান্তরসের পথিক হয়ে আত্মবিনোদন জন্য প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অভিনয় কর্ত্তে আদেশ করেছেন, তুমি যাও অভিনেতৃগণকে বেশ পরিধান কর্ত্তে আদেশ কর।

নটী (সবিস্ময়ং) অচ্চরীঅং। অচ্চরীঅং।

জেন নিঅভূঅবলনিভ্চ্ছিদসঅলরাঅমণ্ডলেন আঅণ্ণাঅট্টিয় কটিণ কো অণ্ড বহুলবরিসন্তদ সনিঅর জ জরিঅ তুরঙ্গ তরঙ্গমালং নিরন্তর নিবড়ন্তত্তিকৃখ বিকৃখিত্ত মহন্ত সন্থপজ্জোগিতুত্তুঙ্গ মাতঙ্গ মহামহীধর সহস্সং ভম্মন্ত ভুঅদণ্ড চণ্ড মন্দরাভিঘাদ ঘুম্মন্ত সঅল পত্তি সলিঅ সংঘাদং কণ্ণসেণ্ণসাঅরং নির্ম্মহিঅ মহুমহনেন বিঅ চ্চীরসমুদ্দং সমাসাদিদা সমরবিজঅ লচ্ছীঃ তস্সসাস্পদং সঅলমুনিঅন সলাহণীঅচরিদস্স কধংতাদিসো উবসমো সংবুত্তো। *

নটী। কি আশ্চর্য্য ? কি আশ্চর্য্য ! ভগবান্ মধুসূদন যেমন সমুদ্রমন্থন করে লক্ষ্মীলাভ করেছিলেন, সেইরূপ যিনি কর্ণরাজের সৈন্যসমুদ্রমন্থন করে বিজয়লক্ষ্মী লাভ করেছেন. যদি বল কর্ণ সৈন্যের সহিত যে সমুদ্রের উপমা দিলে এটাকি ঠিক হ'ল ? সমুদ্রে যে তরঙ্গ থাকে, মধ্যে মধ্যে পাহাড়পর্ব্বত থাকে তোমার এ সমুদ্রে তরঙ্গ কৈ ? পর্ব্বত কৈ ? আছে বৈ কি। অশ্বগুলিই আমার এসমুদ্রের তরঙ্গ, উন্নতকায় হস্তীগুলিই পর্ব্বত।

* আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যং। যেন নিজভুজবলনির্ভৎসিতসকলরাজমণ্ডলেন আকর্ণাকৃষ্টকঠিনকোদণ্ডবহলবৃষ্যমাণসন্ততশরনিকরজর্জ্জরিততুরগতরঙ্গমালং নিরন্তরনিপতত্তীক্ষ্ণবিক্ষিপ্তমহস্তশস্ত্রপর্য্যাসিতোত্তুঙ্গমাতঙ্গমহামহীধরসহস্রং ভ্রমদ্ভুজদণ্ডচণ্ডমন্দরাভিঘাতঘূর্ণমানসকলপত্তিসলিলসংঘাতং কর্ণ সৈন্য সাগরং নির্ম্মথ্য মধুমথনেন ক্ষীরসমুদ্রমিব সমাসাদিতা সমর বিজয় লক্ষ্মীঃ তস্য সাম্প্রতং সকলমুনিজনশ্লাঘণীয়চরিতস্য কথমীদৃশ উপশমঃ সংবৃত্তঃ। ইতি সং)

তাই বল্‌ছিলাম যে যিনি নিজভুজবলে সমস্তনৃপতিগণকে নির্ভৎসিত করেছেন, এবং আকর্ণাকৃষ্ট কঠিন কোদণ্ড হ'তে অবিরতশরনিকর বর্ষণ ক'রে যিনি ঐ তুরঙ্গতরঙ্গসকল জর্জ্জরিত করেছেন, স্বহস্তবিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা উন্নতকায়হস্তীসমূহরূপ মহীধরগণকে বিত্রস্ত করেছেন, এবং অবিরতভ্রাম্যমান মন্দারপর্ব্বতসদৃশ নিজবাহুযুগলদ্বারা যিনি কর্ণসৈন্য সাগর মন্থন করে বিজয়লক্ষ্মী লাভ করেছেন, তাঁর আজ সকল মুনিজনের শ্লাঘনীয় এরূপ উপশম কি করে হ'ল ?

সূত্র। আর্য্যে! নিসর্গসৌম্যমেব ব্রাহ্মং জ্যোতিঃ কুতোহপি কারণ—বশাৎ প্রাপ্তবিকারমপি পুনঃ স্বভাবেঽবতিষ্ঠতে যতঃ সকলভূপালকুল প্রলয়কালাগ্নিরুদ্রেণ চেদিপতিনা সমুন্মূলিতং চন্দ্রান্বয়পার্থিবানাং পৃথিব্যা মাধিপত্যং স্থিরীকর্ত্তুমযমস্য সংরম্ভঃ। পশ্য ;—তথা কল্পান্তসংক্ষোভলব্ধিঃ। শেষভূভৃতঃ স্থৈর্য্যং প্রসাদো মর্য্যাদা স্বা এবহি মহোদধেঃ॥

সূত্র। আর্য্যে! ব্রহ্মতেজ স্বভাবতই সৌম্য কোনও বিশেষকারণে কদাচিৎ বিকারপ্রাপ্ত হ'লেও পুনরায় স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সকল ভূপাল-কুলের প্রলয়কালাগ্নিরুদ্র চেদিপতি পৃথিবী হ'তে চন্দ্রবংশীয়রাজগণের আধিপত্যের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করেছিল, তাই পৃথিবীতে চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের আধি-পত্য স্থির করিবার চেষ্টাই ইহার এই ক্রোধের উদয়। দেখ ;—

কল্পান্ত সংক্ষুব্ধ শেষে যে মহাসাগর।
মুহূর্ত্তে লঙ্ঘন করে উচ্চভূধর॥
স্থিরতা প্রসাদ কিম্বা মর্য্যাদা তাহার।
মুহূর্ত্তপরেতে দেখ ঠিক পূর্ব্বাকার॥

অপিচ। ভগবন্নারায়ণাংশসম্ভূতা ভূতভিত্তোর ভাধিৎপৌরুষভূষণাঃ ক্ষিতিতলমবতীর্য্যনিষ্পাদিতকৃত্যাঃ পুনঃ শান্তিমেব প্রপদ্যন্তে। তথাহি পরশুরামমেব তাবদাকলয়তু ভবতী।

যেন ত্রিঃসপ্তকৃত্বোনৃপবহুলবসাংসমস্তিষ্কপঙ্কপ্রাগ্‌ভারেঽকারি ভূরিচ্যুত-রুধিরসরিদ্বারিপূরেঽভিষেকঃ, যস্য স্ত্রীবালবৃদ্ধাবধি নিধনবিধৌ নির্দ্দয়োদি-ক্রুদ্ধঃ সৌবাঙ্গন্যোচ্চাংশকূটক্রথনপটুরত্যুগ্রঘোরধারঃকুঠারঃ। সোঽপি ধ্বস্তর্ঘ্যাদ-বতার্য্যভারং ভূমেঃ সমুৎখায় কুলং নৃপানাম্ প্রশান্তকোপজ্বলনস্তপোভিঃ শ্রীমান্ মুনিঃ শাম্যতি জামদগ্ন্যঃ।

ভগবান্ নারায়ণের অংশ সম্ভূত মহাপুরুষগণ ভূতহিতের জন্য প্রবল পুরুষকারে ভূষিত হ'য়ে ভূতলে অবতীর্ণ হন, এবং কার্য্যশেষে পুনরায় শান্তভাব অবলম্বন করেন, একবার পরশুরামের দিকেই তাকাইয়া দেখনা যিনি ;—

নৃপতির মজ্জামাংস মস্তিষ্কপঙ্কিল।
ক্ষত্রিয়শোণিতনদী কি মহাআবিল॥
একবিংশবার যিনি তাহাতে তর্পণ।
করিয়া হ'তেন হায় আনন্দে মগন॥
স্ত্রীবালবৃদ্ধাবধি করিতে নিধন।
নির্দ্দয় কুঠার যিনি করেন ধারণ॥
ঘোরধার সে কুঠার ক্ষত্রিয়ছেদন।
করিতে উদ্যত হয়েছিল অনুক্ষণ॥
ভূভার হরিয়া তিনি নিজবাহুবলে।
নাশিয়া ক্ষত্রিয়কুল উদ্ধত সমূলে॥
পুনরায় শান্তভাব করিয়া ধারণ।
করিলেন তপঃ জ্যোতিঃ অঙ্গের ভূষণ॥

তথায়মপি কৃতকৃত্যঃ সম্প্রতিপরমামুপশমনিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ, যেনচ,— বিবেকেনেবনির্জ্জিত্যকর্ণমোহমিবোর্জ্জিতং। শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মনৃপতের্বোধস্যোদয়ঃ কৃতঃ॥ (নেপথ্যে) আঃ পাপ। শৈলূষাধম। কথমস্মাসু জীবৎসু স্বামিনো মহামোহস্য বিবেকসকাশাৎ পরাজয়মুদাহরসি।

সেইরূপ এই গোপালদেব ও কৃতকৃত্য হইয়া সম্প্রতি উপশমনিষ্ঠা প্রাপ্ত হ'য়েছেন। বিবেক যেরূপ মহামোহকে পরাজয় কো'রে প্রবোধ চন্দ্রের উদয় করিয়েছিলেন সেইরূপ গোপাল দেবও কর্ণনৃপতিকে পরাজয় ক'রে কীর্ত্তিবর্ম্ম নৃপতির উদয় করিয়েছেন (নেপথ্যে) রে পাপাত্মা নটাধম। আমরা জীবিত থাকতে আমাদের প্রভু মহা মোহের বিবেকের নিকট পরাজয় ঘোষণা কচ্ছিস্।

সূত্র। (সভয়ং বিলোক্য) অয়ে।

উত্তুঙ্গপীবরকুচদ্বয়পীড়িতাঙ্গ—
মালিঙ্গিতপুলকিতেন ভুজেন রত্যা।
শ্রীমান্ জগন্তি মদয়ন্নয়নাভিরামঃ
কামোহয়মেতি মদঘূর্ণিতনেত্রপদ্মঃ।

নূনং মদ্বচনাচ্চোপজাতক্রোধইবাসৌ লক্ষ্যতে. তদপসরণমেবস্মাকমিতঃ শ্রেয়ঃ (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ প্রস্তাবনা)

সূত্র। সভয়েদৃষ্টি করিয়া) অয়ে ?

উন্নত পীবর কুচযুগলে পীড়িত

পুলকিত ভুজে রতি সহ আলিঙ্গিত

মদবিঘূর্ণিত মরি যুগলনয়ন।

দৃষ্টি মাত্রে মাতাইয়া হায় ত্রিভুবন।

মরি! মরি! কি মূরতি নয়নাভিরাম।

ললিত গমনে হায়। আসিতেছে কাম॥

বোধহ'চ্চে আমার কথায় লোকটা চোটে গ্যাছে, যা হোক আমার এখন এখান থেকে সরে পড়াই মঙ্গল, সূত্রধর ও নটীর প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

(ততঃ প্রবিশতিযথানির্দ্দিষ্টঃ কামোরতিশ্চ)

কামঃ। (সক্রোধং) আঃ! পাপ! (ইতিপঠিত্বা) নন্বরে ভরতাধম!

প্রভবতি মনসিবিবেকোবিদুষামপিশাস্ত্রসম্ভবস্তাবৎ।

নিপতন্তিদৃষ্টিবিশিখাযাবন্নেন্দীবরাক্ষীণাং॥

অপিচ

রম্যংহর্ম্মাতলং নবাঃ সুনয়না গুঞ্জদ্দ্বিরেফা লতাঃ।

প্রোন্মীলন্নবমালিকাসুরভয়োবাতাঃ সচন্দ্রাঃ ক্ষপাঃ॥

যস্যেতানি জয়ন্তি হন্ত! পরিতঃ শস্ত্রাণ্যমোঘানি মে।

তস্যোঃ! কীদৃগসৌবিবেকবিভবঃ কীদৃক্‌প্রবোধোদয়ঃ॥

(কাম ও রতির প্রবেশ)

কাম। রে পাপাত্মা নটাধম! আমরা জীবিত থাকতে আমাদের প্রভু মহামোহের বিবেকের নিকট পরাজয়ঘোষণা কচ্ছিস রে, ভরতাধম! তোদের বিবেকের প্রভুত্ব কতক্ষণ জানিস্ শোন্;—

গীত।

রাগিনী মূলতান, তাল একতালা।

বিবেক থাকে ততক্ষণ।

পণ্ডিতেরি মনে, শাস্ত্র অধ্যয়নে

কিম্বা গুরুউপদেশ শুনে

বহু সুযতনে যাহা করেছ অর্জ্জন॥

হায়! যতক্ষণ করিয়া যতন
কমলনয়না অতি সুবদনা
নাহি করে দৃষ্টিবিশিখবর্ষণ
রম্য হর্ম্ম্যতল, যুবতীসকল
ভ্রমর গুঞ্জন, কোকিল কূজন
নব মালিকায় সুরভি পবন।
চাঁদনী রজনী যাহারে বাখানি
রতির স্বজনী বিবেকনাশন।
থাকে যদি হায় এই সমুদয়
অমোঘাস্ত্রচয় বিবেকদলন।
তাহ'লেত বুঝি বিবেকের বল
কিরূপে বা হয় প্রবোধ উদয়
কেবা করে মহামোহের দমন॥

রতিঃ। অজ্জউত্ত! গুরু ওখু মহারাঅমহামোহস্স পড়িবক্খো বিবেও ত্তিতক্কেমি।*

রতি। আর্য্যপুত্র! মহারাজ মহামোহের প্রতিপক্ষ বিবেককে আমি অতিশয় গুরুতর বলে মনে করি।

কামঃ। প্রিয়ে! কুতস্তবেদং স্ত্রীস্বভাবসুলভং বিবেকাদ্ভয়মুৎপন্নং। পশ্য;——

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

---

* আর্য্যপুত্র! গুরুঃখলু মহারাজমহামোহস্য প্রতিপক্ষো বিবেক ইত তর্কয়ামি। ইতি সং।

মায়া।

সৃষ্টির প্রথমবাল্লে পুরাণ পুরুষ
নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্মসনাতন।
আশ্রিত মায়ায়
আরোপি ত্রিগুণ,
আজ্ঞা দিল নির্ম্মাইতে এতিন ভুবন।
আপনি পুরুষবর রহিল একান্তে
নিশ্চল নিশ্চেষ্ট
সাক্ষী মাত্র হয়ে।
কার্য্যকরী শক্তি লভি
মায়া মোহময়ী
স্থাবর জঙ্গম আদি করিল নির্ম্মাণ
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে আখির পলকে।
পরে সে ত্রিলোকমাতা, করমকুশলা,
আচ্ছাদিত করি সবে নিজ আবরণে
সৃষ্টির প্রধান অংশ করিল গ্রহণ॥

শ্রীভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ

এত কন্যাদায় কেন ?

সমাজে এত কন্যাদায় কেন? শুধু বল্লালীকৌলিন্য ও পণপ্রথা কি এই কন্যাদায়ের জন্য দোষী? তাহা ত নহে। একজন শ্রমজীবির ঘরে অনুসন্ধান করুন দেখিবেন তাহার পাঁচটী পুত্র থাকে ত 'একটীমাত্র কন্যা', একজন চাষীর ঘরে অনুসন্ধান করুন দেখিবেন তাহার ঘরে পুত্রের সংখ্যাই অধিক। কন্যার আধিক্য কেবল বিলাসিতাপ্রিয় ভদ্রসমাজেই অধিক দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে তথাকথিত ভদ্রমহোদয়ের বালকগণ দ্বাদশ

বর্ষের বয়স হইতেই নানারূপ অস্বাভাবিক ও অনৈসর্গিক উপায়ে শরীরের সারভূত বীর্য্যের অপচয় করে, তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তূপীকৃত পুস্তক গলাধঃকরণ করিয়া চাপরাশ লইতে শারীরিক অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রম তাহাদিগকে অধিক করিতে হয়, আর দেশের ঘৃত দুগ্ধ অগ্নিমূল্য বলিয়া তাহা স্পর্শ করিতে না পারায় যুবকগণ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়পতাকা হস্তে লইয়া বহির্গত হইয়া আসে এবং দুইতিনহাজার টাকায় কন্যা বিশেষের পিতার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া সংসারধর্ম্মে মন দেয়, তখন তাঁহার বীর্য্যে সন্তানোৎপাদনের শক্তি আদৌ না থাকায় অথবা স্বল্প থাকায় কেবল স্ত্রীর শক্তিবলে পালে পালে কন্যাগণই প্রসূত হইতে থাকে। ইহার ফলে দিন দিন ভদ্রসমাজে কন্যার সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। যদি বা দুই একটী পুত্র দৃষ্ট হয় তাহা এত রোগজীর্ণ ও শীর্ণ যে তাহার অস্তিত্ব-বিষয়ে সময়ে সময়ে সন্দেহ হয়। যাহা হৌক, কন্যাদায় প্রথা যদি সমাজ হইতে তিরোহিত করিতে হয়, তবে যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের ভবিষ্যবংশধরগণ বাল্যে ও কৈশোরে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিয়া ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হয় এং কোনরূপ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় শরীরের সারবস্তুর অপচয় করিয়া তাহারা সুন্দর, সুঠাম, সৌষ্ঠবসম্পন্ন, বলিষ্ঠতায় সন্তানোৎ-পাদন হইতে বঞ্চিত না হয় তজ্জন্য তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু এ ধর্ম্ম ও নৈতিক শিক্ষা ত প্রচলিত স্কুল ও কলেজে হইবে না। যেখানকার পুস্তকে রোমিও জুলিয়েটের উলঙ্গমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া উদ্ভিন্ন-যুবকগণের হৃদয়ে লালসার বহ্নি প্রজ্বালিত করা হয়—যেখানে সত্যের ছদ্মবেশে মিথ্যাকে সাজাইয়া কিরূপে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে আমরা ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মশিক্ষার আশা করিতে পারি না। স্যার গুরুদাসকে যেমন তাঁর জননী স্বধর্ম্মে, ত্যাগে, ব্রাহ্মণত্বে ও সত্যনিষ্ঠায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং গুরুদাসের চরিত্র যেমন তাঁহার মায়ের সংশিক্ষায় গঠিত হইয়াছিল তেমনিভাবে বঙ্গদেশের জনকজননী স্ব স্ব পুত্রগণকে অবসরসময়ে ব্রহ্মচর্য্য, স্বজাতীয়তা, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ প্রভৃতি শিক্ষা দেন, তবে তাহাদের মনে ধর্ম্মভাবের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে এবং তাহার ফলে বালকগণের মধ্য হইতে এই অস্বাভাবিক উপায়ে বীর্য্য অপচয়ের প্রণালী উঠিয়া গিয়া কালে সুন্দর, সুঠাম পুত্র সন্তানাদি প্রসূত হওয়ায় দেশের মধ্য হইতে এই কন্যাদায়ের ক্রন্দন মন্দীভূত হইতে

পারে ? ইহাই হইল কন্যাদায় স্রোতস্বিনীর মূল এই মূল রোধ না করিয়া শাখা প্রশাখা কর্ত্তন করিলে বিষবৃক্ষের বৃদ্ধি বন্ধ হইবে না।

আর কন্যাকর্ত্তাগণকেও বলি, যদিও মনু বলিয়াছেন রজস্বলা কন্যা ঘরে রাখিলে পিতা সেই কন্যার শোণিত পান করেন তথাপি তাঁহারা যেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পিতৃমাতৃত্বের কর্ত্তব্য ভুলিয়া একটা বৃদ্ধ জরাজীর্ণ, শীর্ণকায় ব্যক্তির হস্তে সোণার পুত্তলী সম্প্রদান করিয়া তাহাকে চির শোক-সাগরে না ভাসান। "পিতা পিবতি শোণিতম্" একথাও যেমন মনু বলিয়াছেন, তেমনি সেই মনুই আবার বলিয়াছেন—

"কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ"

অর্থাৎ কন্যা ঋতুমতী হইলেও আমরণ তাহাকে অবিবাহিত রাখিবে সেও ভাল তথাচ তাহাকে গুণহীন পাত্রে কখনও দিবে না।"

যে পিতামাতা কন্যা জন্মদান করিয়া তাহাকে বৃদ্ধ জরাজীর্ণের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন, আমি সে পিতামাতাকে স্নেহময় ও স্নেহময়ী জনকজননী বলিতে পারি না, তাঁহারা রাক্ষস ও রাক্ষসী—দানব ও দানবী পাষাণ ও পাষাণী।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা

অর্থাৎ কন্যাকেও পালন করিতে হইবে এবং যত্নের সহিত শিক্ষা দান করিতে হইবে, তদনন্তর তাহাকে ধনরত্ন সমন্বিতভাবে বিদ্বান্ বরে দিতে হইবে।"

তিনিই পিতা যিনি এইভাবে কন্যাকে সম্প্রদান করিতে পারেন। তিনিই পিতা যিনি পুত্রকেও যেভাবে লালনপালন করেন, কন্যাকেও সেইভাবে পালন করেন তিনিই পিতা যিনি সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যার আদর্শে কন্যাকে শিক্ষা দান করিতে পারেন এবং তিনিই সত্য পিতা যিনি যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ ধনরত্ন দিয়া বিদ্বান্, সুন্দরপাত্রে কন্যারত্ন অর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু কথা হইতেছে কোন্ পিতামাতার হৃদয়ে কন্যাকে সৎপাত্রে দিবার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত না হয় ? কোন্ পিতামাতা ইচ্ছা না করেন যে আমার কন্যাটী এমন পাত্রের সহিত বিবাহিতা হৌক যাহাকে দেখিলে তাহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়। কিন্তু এই বিদ্বান্

সুপাত্রের ছায়া স্পর্শ করিবার শক্তি কি কাহারও আছে? ইঁহারা এক পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারুন বা না পারুন পণের বেলায় ইঁহাদের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিলে সিংহের গর্জ্জন বলিয়া ভ্রম হয়। একজন "মাতৃকুল অশন" পাশের মূল্য অফিসে ১৫৲ পনর টাকার অধিক নহে, অর্থাৎ দেড়মণ চাউলের মূল্যও যাহা একজন "মাতৃ কুল-অশনের" মূল্যও তাহা, কিন্তু পণের বেলায় ইহাদের মূল্য পাঁচশতের এক কপর্দ্দকও কম নহে। রামায়ণে পড়িয়াছিলাম শ্রীরামচন্দ্র যখন রাবণের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়া আর রাবণকে হত্যা করিবেন না বলিয়া তুষ্ণীম্ভাবে বসিয়া পড়িলেন, তখন দুষ্টসরস্বতী রাবণের রসনায় উপবেশন করিয়া রামের প্রতি এমন সব কটূক্তি করিতে লাগিল যে রাম অবশেষে উত্তেজিত হইয়া রাবণকে নিধন করিলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কন্ধে পুনরায় "সরস্বতীর" আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি এবার শতকরা নব্বই জন বালককে "মাতৃ কুল-অশন" পাশ করাইয়াছেন। ইহার ফলে সরস্বতীর সাধের স্বর্ণলঙ্কা সমৃদ্ধা হইলেও এই "মাতৃ-কুল-অশন" পাশরূপী মৃত্যুবাণের দ্বারা বঙ্গের কতশত কুলবালা যে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। Aesop's fable এর একটা গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পটী এই-একপুকুরে কতকগুলি বালক ঢিল ছুঁড়িতে ছিল, পুকুরে কতকগুলি ভেক ছিল। বালকদের নিক্ষিপ্ত ঢিলের আঘাতে কতকগুলি বেঙাচি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় একটা বৃদ্ধ বেঙ্ উঠিয়া বলিল "ওহে বালকগণ! আম আম, what is play to you, is deth to us অর্থাৎ তোমাদের পক্ষে যাহা ক্রীড়া আমাদের পক্ষে তাহা যে মৃত্যু।" দেশে যাঁহারা নিরাশ্রয়া অভাগী কন্যার অভিভাবক আছেন তাঁহারা যদি একযোগে একবার সিনেট সভায় যাইয়া তথাকার সভ্যগণকে বলেন "ওহে সুধীগণ আর আমাদিগকে ধনে প্রাণে মারিয়া এ বাল্যক্রীড়া করিও না।" তাহাহইলে বোধহয় কতকটা কন্যাদায় কমিতে পারে। আছেন কি কেহ তেমনধারা অকুতোভয়, যিনি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন?

আর দেশের যুবকবৃন্দ তোমাদিগকেও একটা কথা বলি। বলি যে তোমরা মানুষ হও। নিজের উপার্জ্জনে বেন, ঘড়ি ঝুলাও, সাইকেল চড়, মানুষের মত বুক ফুলাইয়া বল, আমরা গরুর মত কন্যার বাজারে বিক্রীত হইয়া বিলাসিতা করিব না। জীবনে একটু ধিক্কার আসেনা? তোমাদের দেশে মাড়োয়ারীগণ লোটা ও কম্বল সম্বল লইয়া আসিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যদ্বারা

আজ কলিকাতা নগরীকে ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় প্রাসাদে প্রাসাদে ছাইয়া ফেলিয়াছে, আর তুমি "শ্বর্বৃত্তি' অবলম্বন করিয়া ভিখারীর ন্যায় কোন মতে দিনযাপন করিয়া নিজের বিলাসিতার উপকরণ নিঃস্ব কন্যার পিতা মাতার নিকট হইতে আদায় করিতেছ? ইহাই তোমার মনুষ্যত্ব। ত্যাগ না করিলে সুখ হয় না, যাহা ভূমা, যাহা নিত্য, তাহার জন্য ধাবিত হও, ত্যাগী হও, তোমার মনুষ্যত্ব আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিবে। তুমি কি মনে কর যে স্ত্রীর মাতাপিতাকে পথের ভিখারী করিয়া তুমি তাহার পাণিগ্রহণ করিলে, সে সমস্ত মন প্রাণ দিয়া তোমায় ভাল বাসিতে পারে? তা কখনই পারে না। যখনই দিনান্তে পরিশ্রমের পর তোমার স্ত্রী তোমার মুখারবিন্দ দেখে তখনই তার মনে হয় যে, এই স্বামী হইতে আমার মাতা পিতা আজ পথের কাঙ্গাল, তখনই তাহার হৃদয় হইতে তোমার প্রতি যতকিছু আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি তিরোহিত হয়, আরও একটা বিষয় আছে, অনেক যুবক আমাকে বলিয়াছেন "মহাশয়। যদি খুব সুন্দরী পাত্রী দিতে পারেন তবে আমি বিনাপণে বিবাহ করিতে পারি।" কি আশ্চর্য্য? এখানেও স্বার্থপরতা। আপনারা কি মনে করেন স্ত্রী সুন্দরী হইলেই তাহার প্রতি দাম্পত্যপ্রেম প্রস্ফুটিত হয়, অপরের হয়না? অনিন্দসুন্দরী, উর্ব্বশী বা রম্ভা মেনকা বা তিলোত্তমার ন্যায় রমণীকে স্ত্রীত্বে বরণ করিয়া তাহার প্রতি যে ভালবাসা তাহা পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম নহে, তাহা "মোহ"—রূপজ মোহ মাত্র। যতক্ষণরূপ ততক্ষণই এই রূপজমোহের নেশা থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রূপের লহর মন্দীভূত হইলে তখন সে স্ত্রীর প্রতি আর তেমন আকর্ষণ থাকে না। নির্ম্মলস্ফটিকস্বচ্ছজলাশয়ে যেমন কুবলয় প্রস্ফুটিত হয় না, সমল পঙ্কিলস্থির জলাশয়ই যেমন পঙ্কজের জন্মস্থান, তদ্রূপ সৌন্দর্য্যের চঞ্চল সরোবরে কখনও দাম্পত্য প্রেমের শতদল প্রস্ফুটিত হইতে পারে না॥ প্রশান্ত শ্বেতশুভ্র সুনির্ম্মলগগণে পূর্ণ ইন্দুর পূর্ণবিকাশ অপেক্ষা শরতের নীলাম্বরে পৌর্ণমাসী শশাঙ্কের অর্দ্ধমূর্ত্তি অধিকতর মনোরম! যে স্ত্রী স্বামীকে তাহার সৌন্দর্য্যমুগ্ধ বলিয়া জানে, সে কখনও তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে পারে না। বিভূতিমণ্ডিত, অহিকুল-শোভিত, দীর্ঘজটাজুটধারী, গঞ্জিকাসেবী মহাদেবকে সতী ভাল বাসিতেন কোন্ গুণে? সে গুণ আর কিছুই নহে; মহাদেব বিশ্বসুন্দরী সতীর রূপের অনলে আত্মবিসর্জ্জন করেন নাই বলিয়া। সতীর রূপের অনলে পতঙ্গের ন্যায়

মহাদেব তাঁহার যোগ, তপঃ, আহুতি দেন নাই বলিয়াই ত সতী মহাদেবকে এত ভালবাসিতেন। শুধু এই কারণেই সতী দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শুনিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তোমরা স্ত্রীকে ভোগের বস্তু বলিয়া মনে কর, স্ত্রী তোমাদের নিকট একটা ভোগ পিপাসার যন্ত্র মাত্র, তাই তোমাদের স্ত্রীও তোমাদিগকে লালসা নিবৃত্তির একটা যন্ত্র বই অন্য কিছুই মনে করে না। এই জন্যই ত বলিতেছি যদি কেহ স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক দরিদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া থাক, তবে আর সুন্দরী অসুন্দরী বলিয়া আপত্তি তুলিও না। শ্রীমতী রাধিকা কেলে সোণা কৃষ্ণকেই ভালবাসিতেন, যমুনার কালজলেই তিনি কেলি করিতে পছন্দ করিতেন। যাহা কাল তাহাই যে ভাল। তাই দেখ বিশ্বপালয়িত্রী মা কালী আমার কালো। এই কালোর সাধনাতেই কত মুমুক্ষু সাধক মুক্তি পাইয়াছেন। কালো মেয়ে বিবাহ কর, তাকে ভোগের বস্তু মনে না করিয়া তার ভিতরে আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ উপলব্ধি কর, আর তার গর্ভে যে সন্তান হইবে তাহাকে ব্রজের গোপাল বলিয়া মনে কর, দেখিবে তোমাদের এই সংসার মরু সুখের বৃন্দাবনে পরিণত হইবে। বিবাহের উদ্দেশ্য কি ? বিবাহ করিলে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সেই সন্তানের মুখ দেখিয়া হৃদয়ে অপত্যস্নেহের উৎপত্তি হইবে। নিজের পুত্রের প্রতি বাৎসল্য উপলব্ধি করিয়া পরের পুত্রকেও বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত করিব, ইহাই ত বিবাহের উদ্দেশ্য। নিজের মায়ের পাদপদ্ম দেখিয়া পরের মাকে—বিশ্বের রমণীবৃন্দকে জননীর সিংহাসনে বসাইব, নিজের ভাইয়ের মুখকমল দেখিয়া পরের ভাইকে ভ্রাতৃস্নেহের প্রেমহারে সম্বর্দ্ধিত করিব, ইহাই ত সংসারের উদ্দেশ্য। "আমিত্বে"র ক্রমবিকাশই সংসারের মূল। এই "আমিত্বের" প্রসারেরই নাম স্বদেশপ্রীতি। যিনি যত আমিত্ব-প্রসার করিয়া পরকে আপন বলিয়া মনে করিতে পারিবেন তিনি তত স্বদেশ প্রেমিক। তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে কত শত অনাথা নিরাশ্রয়া বিধবা কন্যাদায়ে জর্জ্জরিত হইতেছে, যদি তোমরা একটুও স্বদেশপ্রেমিক হও তবে সেই সমস্ত পথের ধূলায় অন্ধ বালিকাদিগকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া পবিত্র প্রেমের স্রকচন্দনে তাহাদিগকে অভিষিক্ত কর, দেখিবে এই শ্মশান ভূমি আবার সোণার অমরাবতীতে পরিণত হইবে। একটা মামুলীকথা আছে "স্ত্রীভাগ্যে ধন।" যদি তোমার স্ত্রীর ভাগ্যে ধন থাকে ত অতি দরিদ্র কন্যাকেও গৃহে আনিলে তাহার আগমনে তোমার সংসার সুখসমৃদ্ধির

সুখী শান্তি পারিজাতে সুশোভিত হইবে। রাণী রাসমণি অতিদরিদ্রের
কন্যা ছিলেন, তাঁহাকে যে সময়ে মধ্যবিত্তগৃহস্থ রাজচন্দ্র বিবাহ করিয়া
আনিলেন সেইসময় হইতেই অলক্ষিতে স্বয়ং কমলাও রাজচন্দ্রের ঘরে
প্রবেশ করিলেন—ভিখারিণী রাসমণি "রাণী" রাসমণিতে পরিণত হইলেন।
অর্জ্জুন যখন কুরুক্ষেত্র মহাহবে সম্মুখে কৌরব ভ্রাতৃগণকে দেখিলেন তখন
গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন——

"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ
ন শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।"

হে বঙ্গের যুবকগণ! তোমরাও কি তোমাদের পিতামাতাকে বলিতে
পার না যে, "হে পিতঃ! দেশের লোকের, স্বজাতির এই জীবন সংগ্রামের
দিনে আমি তাহাদিগকে ধনপ্রাণে মারিয়া সুখী ও ঐশ্বর্য্যশালী হইতে চাহি
না? ত্যাগ দেখাও শৌর্য্য দেখাও, দেখিবে স্ত্রীর প্রেম তোমার দিকে
শতধারায় প্রবাহিত হইয়া প্লাবিত হইবে। দ্রৌপদী অন্যান্যপাণ্ডবভ্রাতা
অপেক্ষা অর্জ্জুনকে অত ভাল বাসিতেন কেন? অর্জ্জুন বীর ছিলেন বলিয়াই
ত। যে কোমল সে কঠোরকেই ভাল বাসে। স্ত্রীজাতি কোমল-স্বভাবা,
তাহারা শৌর্য্যসম্পন্ন পুরুষকেই ভাল বাসে। তুমি যদি সত্যসত্যই স্ত্রীর
ভালবাসা পাইতে চাও, জড়তা পরিহার কর, অকুতোভয় হও, নির্ভীক
হও, তেজস্বী হও, বীরের ন্যায় সংসার সমরাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া পাঞ্চজন্য
নিনাদে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত কর—বীরের ন্যায় দেশবক্ষে স্বাধীনবৃত্তির
বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া অর্থোপার্জ্জন কর—মসীজীবী না হইয়া
ব্যবসায়জীবী হও, দেখিবে শত শত নারীর ভক্তিশ্রদ্ধা-বিজড়িত নির্ম্মাল্য
তোমার চরণতলে লুটাইবে। যেখানে তৃণপত্রাচ্ছাদিত কুটীরে ছিন্নকন্থায়
দেহ আবৃত করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার মাতা রোরুদ্যমানকণ্ঠে বসিয়া আছেন,
হে মহাপ্রাণ যুবকগণ, আজ সেই বঙ্গের কুটীরে যাইয়া তাঁহাদের পদধূলি
লইয়া মেঘমন্দ্রস্বরে বল—"আমরা ঘুচাবো মা তোর দুঃখ মানুষ আমরা
নহিত মেষ।"

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বন্দনা ।

তুমি সত্তারূপী   জগত কারণ
তুমি জ্ঞান মম   নিত্য নিরঞ্জন,
তোমারি চরণে নমি ।

তুমি মুক্তিদাতা,   তুমি অদ্বিতীয়
তুমি সর্ব্বব্যাপী,   তুমিই তুরীয়
প্রণমি চরণে, স্বামী !

তুমি সর্ব্বাশ্রয়,   তুমি স্বপ্রকাশ
এজগৎ প্রভো   তোমাতে বিকাশ,
তোমাতেই পায় লয় ।

তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ   তুমি অঞ্চল,
তুমি দ্বিধাশূন্য   নিত্য নিরমল,
তুমিই ভয়ের ভয় ।

তুমি বিভীষণ   হইতে ভীষণ,
তুমি জীবগতি   পতিত পাবন,
তুমিই অভয়-দাতা ;

তুমিই মহোচ্চ—   পদ নিয়ামক
রক্ষক-গণের,   তুমিই রক্ষক
তুমিই পরম ধাতা ।

তোমারি চরণ,   করিগো স্মরণ,
তোমারি চরণ,   করিগো ভজন,
জগৎ সাক্ষী তুমিগো,—

তুমি সত্যাশ্রয়,   তুমি নিরাধার,
সংসার-সাগরে   তুমি কর্ণধার ।
চরণে তা নমিগো ।

ব্রহ্মচারী আনন্দ চৈতন্য ।

ইতরতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

একস্থানে এক মৃগ ও মৃগী চরিতেছিল, এক ব্যাধ মৃগীকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিল; মৃগী নিজের যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া, ব্যাধ পাছে মৃগকে বধ করে এই চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল, কিন্তু মৃগের জন্মাবধি হৃদয়ে দুঃখ রহিয়া গেল, যে মৃগী বাণবিদ্ধা হইয়াও তাহার মঙ্গলের চিন্তা করিয়াছে—

"বিদ্ধা মৃগী ব্যাধশিলীমুখেন
মৃগোঽপি তৎ কাতরবীক্ষণেন
অসূন্ পরিত্যজ্য গত ব্যথা সৌ
মৃগস্তু জন্মাবধিরাধিরাসীৎ ॥"

ইহাই ভালবাসা!

এক পর্ব্বতের একস্থানে সামান্য জল ছিল; এক মৃগ ও এক মৃগী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল; জল এত অল্প ছিল যে একটী পান করিলে অন্যে পান করিতে পায় না; উভয়ে প্রাণ ত্যাগ করিল, তথাপি কেহ পান করিল না! ইহাকে বলে ভালবাসা!

একটী সত্য ঘটনা বর্ণনা করিতেছি—নবদ্বীপের নিকট একটী গ্রামে একটী যুবক এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া পাবনায় গিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ বৈকালে বেড়া-ইতে যাইতেন। একদিন গমনকালে দ্বিতলে হারমণিয়মের বাদ্য ও সঙ্গীত হইতেছিল—যুবকটী তন্ময় হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন। নিকটের অন্য দ্বিতলে একটী বালিকা ঐ যুবককে দেখিয়া এত তন্মনস্কা হইয়াছিলেন, যে দুইটা গান পরে হইয়াছিল তাহা শুনিতেই পান নাই, পরে যুবক চলিয়া গিয়াছিলেন। পুনরায় একদিন ভ্রমণকালে, সেই বালিকা দ্বিতলের জানালায় বসিয়া উল বুনিতে ছিলেন—যুবক তাহাকে দেখিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে উভয়ের এই-রূপে সাক্ষাৎ চলিতেছিল। ক্রমে প্রকাশ হইল যে বালিকা যুবকের মধ্যম সহো-দরের পত্নীর ভগ্নী। ক্রমে তথায় যুবকের নিমন্ত্রণ আরম্ভ হইল। একদিন নিমন্ত্রণে গিয়া আহারের পর যখন কেহ থাকে নাই তখন বাড়ীর নিকটে বাগানে বালিকা

ফুল তুলিতে গিয়াছিলেন ; যুবকও তথায় গেলেন উভয়ে পরস্পরকে বিবাহ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা হইল। ক্রমে বালিকার বিবাহের কথা উত্থাপন হইলে বাটীর সকলে ঐ যুবকের সহিত বিবাহের কথা উত্থাপন করেন। বালিকার পিতা কহিয়াছিলেন যে "একটা কুটুম্বিতা আছে; আর সেই স্থানে কুটুম্বিতা করিব না।" পরে অন্য স্থানে কন্যার বিবাহ হইয়াছে। কন্যা শ্বশুরবাটীতে গিয়া সমস্ত দিন গৃহের কার্য্য করেন, কিন্তু রাত্রে পতির নিকট শয়ন করেন না। শাশুড়ীকে কহেন যে—"আপনার পুত্রের বিবাহ দেন।" ননদকে কহেন যে "তোমার ভাইএর বিবাহ দাও, আমার কোন আপত্তি নাই। আমি এক শয্যায় শয়ন করিব না।" ঐ যুবক এক স্থানে চাকরি করিতেছেন ঐ কন্যা যুবককে মধ্যে মধ্যে পত্র দেন যে "তুমি বিয়ে কর, আমি শুনিয়া সুখী হইয়া মরিব যে তুমি সুখে আছ।" যুবক উত্তর দেন যে "আমি আর বিবাহ করিব না।" এইরূপে উভয়ের দিন চলিতেছে। কতদিনে যে উভয়ের দেহপাত হইবে ও উভয়ে সুখী হইবেন, তাহা লীলাময়ই জানেন। *

কামের অপূর্ণতায় হৃদয় সাহারার মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিবে, কিন্তু প্রেমের তাহা নহে। তুমি আমায় ভাল না বাসিয়া সুখী আছ আমার তাহাতেই সুখ, কারণ তুমি সুখে আছ। তুমি আমায় কোন দ্রব্য না দিয়া সুখী আছ তাহাতেই আমার সুখ, কারণ তুমি সুখে আছ। রাণী শৈব্যা পতির ঋণমুক্তির জন্য

* পাঠক মহাশয়কে অনেকক্ষণ বিরক্ত করিলাম। এই ঘটনার আমিও অর্দ্ধেক ভুক্তভোগী। আমাকেও একটী ত্রয়োদশবর্ষীয়া হেমাঙ্গী বালিকা বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু আমি তাহার প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া—তাহাকে পায়ে ঠেলিয়াছিলাম। কারণ তখন আমার মনে হইয়াছিল যে, যে স্ত্রীলোক নিজে বিবাহ করিতে চাহে, সে পরে মানিবে না, তখন আমার জ্যেষ্ঠসহোদরের প্রখরভার্য্যার বিষয় স্মরণ হইয়াছিল। ক্রমে স্বর্গের পদার্থ স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে—যাতনা দিবার জন্য স্মৃতিটুকু রাখিয়া গিয়াছে। মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত এ স্মৃতি আমায় পরিত্যাগ করিবে না। দুঃখের কথা অন্যকে কহিলে দুঃখ লাঘব হয়, তজ্জন্য সহৃদয়পাঠকের নিকট কহিলাম, কিন্তু ভুক্তভোগী ভিন্ন এ যাতনা বুঝিবেন না—

"বরিষার কালে, সখি প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি দুইপাশে, তেমতি যে মন
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।"

মে-না-ব—৪র্থ সর্গে।

কষ্টকর দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, ইহাই ভালবাসা! আজকাল এরূপ স্ত্রী দুর্লভ! মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত এরূপ স্ত্রীলাভ করিতে পারেন না—

"———————অনুরাগী।

যুবতিজনঃ খলু নাপ্যতেঽনুরূপঃ॥

ভারবিঃ ১০।৫০

মনের মত স্ত্রী নিশ্চয় পাওয়া যায় না। যতটুকু স্বার্থ ততটুকু "ভালবাসা" (তাহার অন্য নাম নাই); এ ভালবাসা খুব পরীক্ষা করিতে হয়।

"দদর্‌ গওহর্‌ শাহদানদ্‌ ইয়া বদানদ্‌জওহরি"।

বাদসাহ কিম্বা জহুরি হীরা চিনিতে পারে—অন্যে নহে।

আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর সবজজ ছিলেন—পত্নীকে অলঙ্কারে মুড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পীড়িত শয্যায় তাঁহার পত্নী দ্বারে দাঁড়াইয়া নাকে কাপড় দিয়া কেবল প্রাতঃকালে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "কেঁমন আঁচ"—নরকের ছবি আর কোথায়? দাদা সেই কথায় পাশ ফিরিয়া কাঁদিতেন! তাহা স্মরণ করিলে এখনও আমার চক্ষে জল আসে। বন্ধু ও স্ত্রীকে অসময়ে জানা যায়—

ভার্য্যাং ক্ষীণেষু বিত্তেষু ব্যসনেষু চ বান্ধবান্॥

যাহা হউক্ এক্ষণ প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করি। এ হেন ঋণ,—যাহার গতি পরকালেও গিয়া থাকে, সেই ঋণ আইন অনুসারে তিন বৎসরের পর তমাদি হইয়া থাকে। ধর্ম্মভয় করিলে তমাদি হইলেও সে টাকা শোধ দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু এক্ষণ কয়জন সে ধর্ম্মভয় করেন? তমাদি হইলে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ঋণ তমাদি করিবার উদ্দেশ্যে কোন অধার্ম্মিক যদি কোন ব্যবহারজীবির আশ্রয় গ্রহণ করেন ও যদি সেই ব্যবহারজীবী অর্থলোভে অধর্ম্মের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কি তিনি ভদ্রবেশে সাজিয়াই ভদ্র বলিয়া গণ্য হইবেন?

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

পল্লীভবন।

হে পল্লীভবন মোর! হে রূপসী, হে সুন্দরী—চির-অনুপমা,
আনন্দের রম্য নিকেতন ওগো, মেলি তব মায়া মনোরমা
টানিছ তোমার পানে অহর্নিশি অসন্তুষ্ট-ক্ষুব্ধ লুব্ধ চিত্ত মোর
সরল মধুর—প্রিয়-দিতে চির আন্তরিক ভালবাসা তোর।
বিদেশে প্রাসাদবাসে-বিলাস বিলোলগেহে তোর মূর্ত্তিখানি
হাস্যময়ী, লাস্যময়ী, সজ্জাহীনা, ওরে মোর হৃদয়ের রাণী!
আমোদ উৎসব মাঝে, পতাকাশোভিত- দীপোজ্জ্বল-রম্যগেহে
জাগেরে মানসে মোর, বেদনার অশ্রুধারা নয়নেতে বহে।
সুন্দর কুটীরখানি, শ্যামলিম পত্রগুচ্ছে-সবুজবসনে—
নাহি জানি চোখে মোর মাখায়েছ কিবা মায়া মোহের অঞ্জনে!
না! না! সে ত মোহ নয়—মোহ নয় কভু তাহা, সে যে স্নেহরস
পরম পবিত্রতমা-নন্দন চয়িত সুধা-সঞ্চারি পরশ।
আমার কুটীরখানি সে যে মোর আপনার—অতি আপনার,
কর্ম্মলীন বিশ্বমাঝে সেই ঢালে চিত্তে বিজন শান্তির ধার,
কল কোলাহল হ'তে ব্যস্ত কলরব হ'তে সেই মোরে শুধু
দেয় পিতে-বিজন আপন গেহে-অনাবিল-সমাধির মধু।
বিশ্বের উৎসবদ্বারে-গীতিগন্ধেছন্দে-দীপমালিকার হারে
যেথায় অনন্তহাসি-পুলকের কলরব সাম্রাজ্য বিথারে,
সেথা তোর নাহি স্থান-গরীব কুটীর মোর, জানি তাহা জানি,
নিঃশব্দে নীরবে নিত্য-আছ মৌন মূক লাজে, মানি তাহা মানি,
তবু তুই ওরে আপনার—চির আপনার পল্লীর ভবন!
তোরে ফেলি নাহি চাহি বিশ্বরাজ্য সুরিয়াট্‌-কাঞ্চন রতন।

শ্রীমতিলাল দাস।



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেবচ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে পার্থ দুর্ম্মেধাঃ (দুষ্টা অবিবেকবহুলা মেধা যস্য সঃ দুর্ম্মেধা অবিবেকী জনঃ) যয়া (ধৃত্যা) স্বপ্নং (নিদ্রাং) ভয়ং (ত্রাসং) শোকং (সন্তাপং) বিষাদং (বিষণ্ণতাং) মদং (বিষয়সেবাবহুলং আত্মনো বহুল-জ্ঞানংমানং মদং) ন বিমুঞ্চতি (স্বপ্নাদিকম্ বিমুঞ্চতি পুনরাবর্ত্তয়তি) সা ধৃতিঃ তামসী। ৩৫

বঙ্গানুবাদ। দুর্ব্বুদ্ধিব্যক্তি যে ধৃতি অবলম্বনে নিদ্রা, ভয় শোক বিষাদ ও মত্ততা পরিত্যাগ করে না, তাহা তামসী ধৃতি। ৩৫

আলোচনা। অবিবেকী ব্যক্তি যে ধৃতির বশে অতিনিদ্রা, সামান্য হেতুতে ত্রাস, ইষ্টবস্তুর নাশে শোক, অপ্রিয়কার্য্যে বিষণ্ণতা এবং বিষয়সুখভোগে মত্ততা ত্যাগ করিতে পারে না, তাহাকে তামসীধৃতি কহে। তামসী ধৃতি ঐহিক নিন্দা ও পারত্রিক অধোগতির হেতু। ৩৫

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬
যত্ তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তত্সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

সান্বয়ব্যাখ্যা। অথ সত্ত্বাদিগুণভেদেন সুখস্য ত্রিবিধো ভেদ উচ্যতে। হে ভরতর্ষভ (অর্জ্জুন) ইদানীং তু ত্রিবিধং (ত্রিপ্রকারং) সুখং মে (মম সকাশাৎ) শৃণু (অবধারয়) (তত্র সাত্ত্বিকসুখমাহ) যত্র (যস্মিন্ সুখে) অভ্যাসাৎ (নতু ধনসম্পৎ সুখমিব রাগাৎ) রমতে (রতিং প্রাপ্নোতি রতিং প্রতিপদ্যতে) দুঃখান্তং (দুঃখোপশমং) নিগচ্ছতি (নিশ্চয়েন চিরং প্রাপ্নোতি) যৎ তৎ (সুখং) অগ্রে বিষমিব (দুঃখাত্মকং যমনিয়মাসন-প্রাণায়ামাদ্যারম্ভে আয়াসবাহুল্যদর্শনাৎ) পরিণামে (জ্ঞান-বৈরাগ্য-যম নিয়মাদ্যভ্যাসজং) সুখং অমৃতোপমং, আত্মবুদ্ধি প্রসাদজং (আত্মবিষয়া

বুদ্ধিঃ তস্যাঃ প্রসাদঃ রজস্তমোত্যাগেন নির্ম্মলত্বলাভঃ ততোজাতং তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং (ভক্তৈঃ) ৩৬। ৩৭

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন, এক্ষণ আমার নিকট ত্রিবিধসুখের বিষয় শ্রবণ কর। যে সুখের ক্রম-অভ্যাসে দুঃখের চির অবসান হয়, এবং যে সুখ অভ্যাস করিতে অগ্রে বিষবৎ ক্লেশকর হইলেও পরিণামে অমৃততুল্য হয়, যে সুখ আত্মবুদ্ধির নির্ম্মলতা হইতে জন্মে, সেই সুখই সাত্ত্বিকসুখ বলিয়া কথিত হয়। ৩৬। ৩৭

আলোচনা। জ্ঞান-জ্ঞেয়-কর্ত্তা-বুদ্ধি-ধৃতি গুণভেদে তিন প্রকার করিয়া বলা হইয়াছে। এখন সুখের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। সুখই জীবের প্রার্থনীয়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন সুখ গ্রাহ্য কোন সুখ ত্যাজ্য। কোন সুখ পরিণামদুঃখজনক এবং কোন দুঃখ পরিণামসুখজনক—তাহাই এক্ষণ বলিতেছেন। জগৎ সুখ দুঃখ মিশ্রিত। যে সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে দুঃখে পরিণত হয় না, জগতে তাদৃশ সুখ সুদুর্লভ। এজন্য জ্ঞানীর মত এই যে, অগ্রে কিছুকাল দুঃখভোগ করিয়া অনন্তকাল যে সুখভোগ করা যায় তাহাই প্রকৃত সুখ। বিষয়ভোগজনিত সুখে আপাততঃ আনন্দ হয় বটে, কিন্তু তাহা দুঃখমিশ্রিত এবং অস্থায়ী। তাহাতে কাহার বিতৃষ্ণা জন্মে, কাহার ক্ষণভঙ্গুরসম্পৎনাশে পুনরায় দুঃখ উপস্থিত হয়। বিশেষ তাহা ঐহিকের জন্য মাত্র। যাহা ঐহিক পারত্রিক উভয়ত্র হিতকর তাহাই অবলম্বনীয় তাদৃশ সুখের অভিলাষী হইলে আপাতসুখকর বিষয়বাসনা হইতে মনকে সংযত করিয়া শাস্ত্র ও গুরূপদেশে আস্থা করিয়া আয়াসপূর্ব্বক যমনিয়ম আসন প্রাণায়ামাদি শিক্ষা করিতে হয়। তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান-বৈরাগ্য লাভ হয়, দেহ ও আত্মার ভিন্নবোধ জন্মে। এই নির্ম্মল আত্মবুদ্ধিজনিত সুখই অমৃতোপম ব্রহ্ম সুখ। এই সুখ ক্রমঅভ্যাস দ্বারা লাভ করিতে হয়। তাই বলিয়াছেন "অভ্যাসাৎ"। এই ব্রহ্মসুখই সাত্ত্বিক সুখ। ইহা সাধনসাপেক্ষ। ৩৬। ৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

সান্বয়ব্যাখ্যা। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয়ানাং ইন্দ্রিয়ৈঃ সংযোগাৎ চক্ষু-কর্ণজিহ্বোপস্থাদিসংসর্গাৎ) যৎ (সুখং) তৎ অগ্রে (প্রথমক্ষণে) অমৃতোপমং (অমৃত সমং) পরিণামে বিষমিব (বিষতুল্যং দুঃখহেতুত্বাৎ) তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্। ৩৮

বঙ্গানুবাদ। বিষয়—ইন্দ্রিয়-সংযোগে উৎপন্ন যে সুখ, তাহা প্রথমে অমৃততুল্য বোধ হয়, পরিণামে বিষবৎ অনিষ্টকর, তাহাই রাজস সুখ।

আলোচনা। পূর্ব্বশ্লোকে সাত্ত্বিকসুখের কথা বলা হইয়াছে। এখন রাজসিক সুখের কথা বলা হইতেছে। সাত্ত্বিক সুখ নিবৃত্তিমূলক, রাজসিক সুখ প্রবৃত্তিমূলক। সাত্ত্বিকসুখ ত্যাগের, রাজসিকসুখ ভোগের। ইন্দ্রিয় ও বিষয়সংযোগে জাত আপাততঃ অমৃতের ন্যায় প্রীতিকর এবং পরিণামে বিষবৎ অনিষ্টকর যে সুখ তাহাই রাজস সুখ। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত পদ বাক্‌পায়ু উপস্থ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন অন্তরিন্দ্রিয় এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ এবং গ্রহণ গমন ভোজন মলত্যাগ ও আনন্দ। উক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় সংযোগের অনুভবই মনের কার্য্য। এই সকল ইন্দ্রিয়ের অনুকূল-তৃপ্তিকর বিষয়ভোগের নাম সুখ। চক্ষুর অনুকূল ও তৃপ্তি সুরূপবস্তু-দর্শনে, কর্ণের তৃপ্তি সুস্বরগীতবাদ্যাদিশ্রবণে। এইরূপে সুগন্ধ আঘ্রাণে, সুমধুররস আস্বাদনে, সুকোমল দ্রব্যস্পর্শে এবং স্ত্রীসম্ভোগাদিতে যে সুখ তাহাই বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজ সুখ এবং ইহাই রাজস সুখ। এই সুখলাভের জন্য যমনিয়ম আসন প্রণায়ামাদিদ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিতে হয় না বলিয়া ইহা প্রথমে অমৃতোপম, কিন্তু জরার আক্রমণে যখন শরীর বিকল হয়—এই সকল সুখভোগে শরীরের সামর্থ্য থাকে না। সুখের মত্ততায় পারলৌকিক কোন চিন্তাই মনে থাকে না। এই সুখের অবসানে ভোক্তার ঐহিক পারত্রিক বহুদুঃখ ভোগ করিতে হয় বলিয়া এই রাজসিক সুখকে পরিণামে বিষবৎ বলা হইয়াছে। রাজসিক সুখের আর একটী মুখ্য দোষ এই যে, ইহার ভোগপিপাসা মিটে না, জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ভোগাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। যখন শরীরে ভোগের শক্তি থাকে না, তখন শরীর বিষক্রিয়ার ন্যায় অনুতাপে দগ্ধ হয়। আপাতমধুর পরিণামবিষবৎ ঈদৃশ রাজস সুখভোগচেষ্টা বিবেকী জনের কর্ত্তব্য নয়। ৩৮

যদগ্রেচানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

সান্বয়ব্যাখ্যা। যৎ (সুখং) অগ্রে (প্রথমক্ষণে) অনুবন্ধে চ (অবসানে উত্তরকালে পশ্চাদপি) আত্মনো মোহনং (আত্মবিষয়া যা বুদ্ধিঃ তস্যাঃ মোহকরং) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং (নিদ্রালস্যপ্রমাদেভ্যঃ সমুৎপন্নং) তৎসুখংতামসং উদাহৃতম্। ৩৯

বঙ্গানুবাদ। যে সুখ প্রথমে ও শেষে আত্মবিষয়ে বুদ্ধিকে মুগ্ধ করে এবং নিদ্রা আলস্য ও অনবধানতা হইতে জন্মে, সেই সুখ তামসসুখ বলিয়া কথিত হয়। ৩৯

আলোচনা। যে সুখ প্রারম্ভে ও পরিণামে আত্মজ্ঞানের বিরোধী, নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই তামস সুখ। বিবেক বিচারদ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় হয়। যাহারা আলস্য ও নিদ্রার বশীভূত, তাহারা সর্ব্বদা অনবধান। এজন্যই তাহাদের পরিচালক আলস্য নিদ্রা ও অনবধানতায় তাহাদের জ্ঞান অভিভূত থাকে। এই আলস্য নিদ্রা ও অনবধানতা হইতে যে সুখ জন্মে তাহাই তামস সুখ। বিষয়সম্পৎ ধন পরিজন সকলই আছে—আলস্যবশতঃ যথাযথ কর্ম্মে নিয়োগ করা হয় না। অবসরের যে সুখ, নিদ্রাতুর ব্যক্তির নিমীলিতনেত্রে থাকিয়া যে সুখ ভোগ করে, তাহাই তামস সুখ। একটী গল্প আছে—দুইজন পক্ক অহিফেনসেবী (গুলিখোর) মত্ততার অবসাদে তন্দ্রাঘোরে শয়ন করিয়া আছেন। এদিকে শরীরে সূর্য্যতাপ লাগিয়াছে—জঠরে ক্ষুধানল জ্বলিয়াছে, তথাপি উঠিতে ইচ্ছা হইতেছে না। একজন অর্দ্ধ নিমীলিতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন "কত রবি জ্বলে" অন্যে উত্তর করিলেন—"কেবা আঁখি মেলে" অর্থাৎ জিজ্ঞাসা হইল কত বেলা হইয়াছে ? উত্তর হইল, কে চক্ষু মেলিয়া দেখে। আলস্য নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া থাকাই ইহাদের সুখ। নিদ্রা ও আলস্যে যে সুখ তাহাই তামসসুখের সহজ দৃষ্টান্ত। ৩৯

নতদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃস্যাৎত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০

সান্বয়ব্যাখ্যা। পৃথিব্যাং বা (ভূর্লোকে বা শব্দাৎ পাতালেচ) পুনঃ (এবং) দিবি (স্বর্গে) দেবেষু (দেবতাদিষু) (তৎ তাদৃশং) সত্ত্বং (প্রাণিজাতং) ন অস্তি যৎ প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিসম্ভবৈঃ প্রকৃতিসমুৎপন্নৈঃ) এভিঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) ত্রিভির্গুণৈর্মুক্তং স্যাৎ। ৪০

বঙ্গানুবাদ। পৃথিবীতে বা স্বর্গে কিম্বা দেবতাদিগের মধ্যে এমন প্রাণী নাই যাহাতে প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি এই তিন গুণ নাই। ৪০

আলোচনা। পরমাত্মা ব্যতীত সকলই সত্ত্বাদিত্রিগুণাত্মক। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, বৈষম্যাবস্থাই সৃষ্টি ; সুতরাং সৃষ্টপদার্থমাত্রেই ত্রিগুণযুক্ত। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা গুল্ম যাবতীয় সৃষ্ট

বস্তুই সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। কোনবস্তুই এই ত্রিগুণ হইতে মুক্ত নয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাসগুপ্ত।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো,
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ। ভা ১।৫।১১

যে বাক্যে অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের যশঃ অঙ্কিত নাম বিন্যস্ত আছে, তাহা ব্যাকরণাদি-দোষ-দুষ্ট হইলেও সেই বাক্য উচ্চারণমাত্রেই জনসমূহের পাপের বিনাশ করে। সাধু-মহাত্মারা, সতত সেই অনন্তগুণাকরের গুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন করেন এবং স্বয়ং বলিতে থাকেন। ভাগবতচূড়ামণি, মহর্ষি নারদের এই উপদেশ মস্তকে বহন করিয়া মাদৃশ মূঢ়, অসাধ্যসাধনে ব্রতী হইয়াছে। যে ভগবান্ শ্রীহরির নাম-মাহাত্ম্য স্বয়ং ভগবান্‌ও বলিতে অক্ষম, সে বিষয়ে ক্ষুদ্রশক্তি মানবের প্রয়াস করা বাতুলতা মাত্র। তবে যাহার বাগযন্ত্র আছে, সেই কিছু শব্দ করে; সেই সূত্রে এ অধম কিঞ্চিন্মাত্র মধুর ভগবন্নাম রসনায় গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে।

প্রাণবল্লভের বাঁধা বীণা, তাঁর গুণগানে যদি রত থাকে, তবেই তার জীবন সফল। তাহা হইলেই রসময়ের রসাস্বাদজন্য তার জনম সফল হইবে, নচেৎ ভেকজিহ্বাতুল্য মনে করিব। যাঁর জন্য আসা, যাঁর জন্য প্রাণের আশা, তাঁহাকে ভুলে থাকা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি আছে? যাঁকে চাই, তিনি হৃদয়েই আছেন, আমি অন্ধ বলিয়া দেখিতে পাই না। অচ্যুতভাব-বর্জ্জিত, জ্ঞান, কর্ম্ম, যাগ, যোগ সমস্তই বৃথা। অনভ্যস্তভগবন্নামশ্রবণে মানবের স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই। নামে রুচি জন্মিবার জন্য প্রথমতঃ পুণ্যতীর্থসেবা

করিতে হয়, তার ফলে, সাধুসঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। তার ফলে শ্রীহরির নামাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে, তার পর নামে রুচি জন্মে। তীর্থসেবা, সৎসঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা বিগতপাপ শুদ্ধচিত্ত না হইলে সহজে শ্রদ্ধা ও রুচি জন্মে না। ধর্ম্মের মুখ্যফল, ভগবৎ সাক্ষাৎকার, গৌণফল চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি। যতদিন সেই একমাত্র প্রেমপাত্র গোবিন্দের দর্শন না মিলিবে, ততদিন ধর্ম্ম আনুষ্ঠানিক ব্যাপারমাত্র। যতদিন সেই প্রেমসিন্ধুর প্রতি চিত্ত ধাবিত না হইবে, তাঁর নামে রুচি না জন্মিবে, ততদিন ধর্ম্মাচরণ পণ্ডশ্রমমাত্র। চিত্তনদী যতদিন প্রেমসিন্ধুতে না মিশিবে ততদিন কিছুতেই শান্ত হইবে না। শান্তিপুরে উপনীত না হইলে অদ্বৈতের দর্শন মিলিবে না। আমরা ভগবৎবিমুখ, বিষয়াস্বাদলোলুপ, সুতরাং দৃঢ়শক্তিপ্রভাবে মন না বাঁধিতে পারিলে, শান্তিপুরে প্রবেশ করা অসম্ভব। অশান্তচিত্তব্যক্তির সুখ কোথায় ?

সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মাসুপ্রসীদতি ॥

যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে মতি, রতি জন্মে, তাহাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। যাহা হইতে তারপ্রতি ভক্তি জন্মে তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, যাহা হইতে আত্মা সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন ও শান্ত হয়। সেইভক্তিকোনরূপ বিঘ্ন হইতে বাধা প্রাপ্ত হয় না—তাহার গতি কিছুতেই রোধ করিতে পারে না। ভক্তিই ভগবদ্বশীকারিণী শক্তি, একমাত্র ভক্তিগুণেই ভগবানকে বাঁধা যায়, অন্য কোন সাধনে তাহা ঘটে না।

অকপটভাবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তিযোগ। প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও সমাপ্তি। মুহূর্ত্তস্থায়ী ভগবৎপ্রেমোন্মত্ততাও শাশ্বতী মুক্তির প্রসূতি। জীব এতল্লাভে সর্ব্বভূতে প্রেমবান্ ও ঘৃণাশূন্য হয় এবং অনন্তকালের জন্য তুষ্টি লাভ করে। এই প্রেমের দ্বারা কোন কাম্যবস্তু লাভ হইতে পারে না। কারণ, বিষয়বাসনা থাকিতে এই প্রেমের উদয়ই হয় না। ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠতরা," কারণ সাধ্যবিশেষই উহার লক্ষ্য; কিন্তু ভক্তি স্বয়ংই সাধ্য ও সাধনস্বরূপা। সাধারণ লোকের সংস্কার ভক্তি ও জ্ঞান অতিশয় পৃথক্ বস্তু; বাস্তবিক তাহা নহে। ভক্তিযোগে * এক বিশেষসুবিধা, উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পঁহুছিবার অতিসহজ ও স্বাভাবিক পন্থা। কিন্তু উহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা এই যে, নিম্নস্তরের ভক্তি অনেকসময়ে ভয়ানক গোঁড়ামীর আকার ধারণ করে। তবে এ আশঙ্কা কেবল ভক্তির নিম্নস্তরেই

আছে, এই অবস্থার নাম গৌণী। উহা একটু পরিপক্ক হইয়া পরাভক্তিরূপে পরিণত হইলে আর কোনও আশঙ্কা থাকে না। পরাভক্তিতে অভিভূত ব্যক্তি আর কখনও অপরের প্রতি ঘৃণাভাব বিস্তারের যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারে না।

এ জীবনেই সকলেই যে সামঞ্জস্যের সহিত চরিত্রগঠন করিবে, তাহা সম্ভব নহে। তবে আমরা জানি, যে চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সমভাবে বিরাজমান, সেই চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চদরের। পাখীর উড়িতে তিনটী জিনিষের আবশ্যক, দুটী পক্ষ ও চালাইবার হা'ল স্বরূপ একটী পুচ্ছ। জ্ঞান ও ভক্তি দুইটী পক্ষ, যোগ উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য পুচ্ছস্বরূপ। যাঁহারা এই তিনরূপ সাধনপ্রণালী একসঙ্গে সামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ভক্তিই একমাত্র পথস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কলাপ প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় হইলেও তাহাদের উপযোগিতা কেবল ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম জন্মিয়া দেওয়া মাত্র। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তি-মার্গের উপদেষ্টৃগণের মধ্যে একটু সামান্য মতভেদ আছে। জ্ঞানীরা ভক্তিকে মুক্তির উপায়মাত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু ভক্তেরা উহাকে উপায় ও উদ্দেশ্য দুই বলিয়া থাকেন। বোধ হয়, এ প্রভেদ নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে সাধনস্বরূপ ধরিলে নিম্নস্তরের উপাসনা মাত্র বুঝায়। আর নিম্নস্তরের এই উপাসনাই একটু অগ্রসর হইলে উচ্চস্তরের ভক্তির সহিত অভেদভাব ধারণ করে। কারণ পূর্ণভক্তির উদয়ে প্রকৃতজ্ঞান অযাচিত হইলেও আসিবেই আসিবে। আর পূর্ণজ্ঞানের সহিত ভক্তিরও প্রকৃত অভেদ। শঙ্করাচার্য্য বলেন, পতি বিদেশে গমন করিলে, পতিপরায়ণা সতী স্ত্রী যেমন নিরন্তর পতিকে ধ্যান করে, ঈশ্বরের প্রতি তাদৃশ অবিচ্ছিন্ন ধ্যান প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাই ভক্তি নামে খ্যাত হয়। রামানুজ বলেন, "একপাত্র হইতে অপর-পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্নতৈলধারার মত প্রবাহিত ধ্যেয়বস্তুর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান।" যখন এমত ভগবৎস্মৃতির অবস্থালাভ হয়, তখন সকল বন্ধন নাশ হয়। বেদান্ত সূত্র। ৪র্থ অধ্যায় ১ম পাদ, প্রথম সূত্র, শাঙ্করভাষ্য। ভবতি চ স্মৃতির্ভাবনাপ্রকর্ষাৎ দর্শনরূপতা। ভাবনার প্রবলতা-নিবন্ধন স্মৃতিই দর্শনের অর্থাৎ প্রত্যক্ষের তুল্য হয়। আর উপাসনার অর্থও সর্ব্বদা স্মরণ, ইহা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ভগবান্‌কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল

বাসিতে হইবে। কারণ, ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, যাহারা আমাতে নির-ন্তর আসক্ত আমিও তাহাদের প্রতি সেইরূপ আসক্ত। যদিও ভগবান্ সর্ব্বভূতের জীবনস্বরূপ, তথাপি ভক্তহৃদয়ে তিনি সমধিক প্রকট হইয়া ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেন। আমরা ভাবি তিনি আমাদের ক্রন্দন শুনিতে পাননা, সেটা আমাদের ভ্রমধারণা। তিনি সাধুদিগের দুঃখবিমোচনার্থ এবং পাপি-দিগের বিনাশের নিমিত্ত, উপযুক্ত সময়েই প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিতে এই জগতে দেখা দিয়া থাকেন। তাঁরমত পরম কারুনিক দ্বিতীয় নাই। তাঁহাকে উপলব্ধি করা কি সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় নহে? ইহাই কি জীবনের সর্ব্বোচ্চ প্রয়োজন নহে? এমন লোক জগতে আছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক। যাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহা মানবকে পাশবসুখ দিতে পারে, তাহার বাস্তবিক প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে। ধর্ম্মই বল, আর ঈশ্বরই বল, যদি তাহা হইতে, সুখ, অর্থ না পাওয়া যায়, তবে, তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের হৃদয়ে উচ্চতরবিষয়ের ব্যাকুলতা জন্মিতেও বহুজন্ম লাগিবে। যাঁহাদের চক্ষে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি অবোধ শিশুর ক্রীড়াপ্রায় বোধ হয়, তাহাদের চক্ষে ভগবান্ ও ভগবৎপ্রেমই জীবনের সর্ব্বোচ্চ প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় যার ভোগ লালসা পূর্ণ, এজগতে এমত মহাত্মা বিরল নহে। যাঁহারা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রাণপ্রতিমপুত্তলিকাগুলি অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারেন। তাঁহারা স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করেন। প্রেমের এমনি একটা মাদকতা শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে, মানব সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হয়। পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে মানব প্রকৃতির নিষ্ঠুরতাড়না প্রাপ্ত হইয়া সকাতরে পরিত্রাহি বলিয়া কোন অজ্ঞাতপুরুষের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়াছে। প্রকৃতির আবরণ উন্মোচন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অদম্য অধ্যবসায় বলে শেষে মানব জানিতে সক্ষম হইয়াছে, যে, প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ না ঘুচিলে দুঃখ দূর হইবে না। সেই দুঃখ পরিহারের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চলিতেছে। সেই জন্যই সাধনের আবশ্যক। ভক্তি মার্গে অগ্রসর হইতে হইলে সাধনাবস্থায় কতকগুলি বাহ্যসহায় না হইলে চলে না। বাস্তবিক সকল ধর্ম্মের পৌরা-ণিক ও রূপকভাগ আপনা আপনি আসিয়া থাকে ও উন্নতিকামী আত্মাকে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। আরও ইহা একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, যে সকল ধর্ম্মপ্রণালী পৌরাণিকভাববহুল ও

অনুষ্ঠান প্রচুর, সেই সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই বড় বড় ধর্ম্মবীর জন্মিয়াছেন। যে সকল শুষ্ক গোঁড়ামিপূর্ণধর্ম্মপ্রণালীতে, যাহা কিছু কবিত্বময়, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহান্, যাহা ভগবৎপথে স্খলিতপদে অগ্রসরমুমুক্ষুর-মনের দৃঢ় অবলম্বনস্বরূপ, সেইভাবগুলিকে একেবারে সমূলে উৎপাটন করিতে চাহে। যে সকল প্রণালীতে ধর্ম্মের অবলম্বন স্তম্ভগুলিকে পর্য্যন্ত ভগ্ন করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে ও সত্যসম্বন্ধে অজ্ঞান ও ভ্রমপূর্ণধারণা লইয়া, যাহা কিছু জীবনীশক্তি সঞ্চারক, যাহা কিছু মানব আত্মারূপক্ষেত্রে উৎপদ্যমান ধর্ম্মরূপলতিকার গঠনোপযোগী উপাদান, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত দূর করিয়া দিতে চাহে, সেই সকল ধর্ম্মে শীঘ্রই দেখিতে পাওয়া যায়, যে, অন্তঃসারশূন্য একটী আধারমাত্র,—অনন্ত শব্দরাশিও তর্কাভাসের স্তূপমাত্র। হয়ত একটু সামাজিক আবর্জ্জনা নিরাকরণ বা তথাকথিত সংস্কারপ্রিয়তার গন্ধযুক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহাদের ধর্ম্ম এইরূপ, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জড়বাদী। তাহাদের ঐহিক পারত্রিক জীবনের লক্ষ্য কেবল ভোগ, উহাই তাহাদের মতে মানবজীবনেরলক্ষ্য, এই অজ্ঞান গোঁড়ামীর অদ্ভুত মিশ্রণরূপ-মতাবলম্বিগণ যতশীঘ্র তাহাদের প্রকৃতবেশে বাহির হইয়া নাস্তিক ও জড়বাদিদিগের দলে যোগদেয় ততই সংসারের মঙ্গল। একবিন্দু ধর্ম্মানুষ্ঠান ও অপরোক্ষানুভূতি, রাশি রাশি বাক্প্রপঞ্চ ও মূর্খসুলভ ভাবোচ্ছ্বাস হইতে সহস্রগুণে গরীয়সী। অজ্ঞান ও গোঁড়ামীর শুষ্ক্ ঊষরময়ক্ষেত্রে একজন,—কেবলমাত্র একজন অমিততেজা ধর্ম্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিতে পার? না পার চুপ্ কর। হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দাও, সত্যের বিমলালোক প্রবেশ করুক। নিজের জন্য মানব নিজেই দায়ী। অন্যকে প্রতারিত করিয়া স্বীয় স্বার্থ বা ধন-প্রয়াসিধূর্ত্তেরা অনেক সময় নিজেই প্রতারিত হয় বা নিহত হয়। এই পৃথিবীতে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া কতশত ব্যক্তি, প্রতারণার জাল পাতিয়া নিরীহ, সরল প্রকৃতি নরনারীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এইমাত্র করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত নহে, তাহারা সতত নিজের দল পুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত আছে। এই সংসারে অধিক সংখ্যক লোকই অধঃপতিত। তাহার কারণ, তাহারা ধর্ম্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করেনা। প্রেমবান্ ব্যক্তি স্বভাবতই অদ্রোহী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্। অধার্ম্মিক ব্যক্তি-রাই উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্ম, অর্থ বা সুখ না দিলেও জগতের কতটা উপকার সাধন করে, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইতে পারে।

ধর্ম্ম, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানবের হিতসাধন করে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই। আদর্শচরিত্রলাভ ধর্ম্মের একটা আনুষঙ্গিক ফল।

যদিও সকল আত্মাই এক সময় পূর্ণতা লাভ করিবে, ইহা নিশ্চিত; তাহা হইলেও সাধনের আবশ্যক আছে। আমরা এখন যাহা তাহা আমাদিগের অতীতচিন্তারাশির ও কার্য্যের ফলস্বরূপ। আর এক্ষণে যেমন চিন্তা ও কার্য্য করিতেছি ভবিষ্যতেও তাহাই হইব। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতেছি বলিয়া যে, আমাদের বাহির হইতে কোন সাহায্যের আবশ্যক নাই এমত নহে। যখন আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হই, তখন আত্মার উচ্চতরশক্তি ও আপাত অব্যক্তভাবগুলি ফুটিয়া উঠে। আধ্যাত্মিকজীবন সতেজ হইয়া উঠে, উহার উন্নতি সত্বর হয়, ও অবশেষে সাধক শুদ্ধস্বভাবও সিদ্ধ হইয়া যায়। এই "সঞ্জীবনীশক্তি" গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতেই সাহায্য পাইতে পারে। আমরা সারাজীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, খুব একজন বুদ্ধিজীবী হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখিব যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই।

বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আমরা খুব শিক্ষিত হইয়া আধ্যাত্মিক বাক্যবিন্যাসে নিপুণ হইলেও প্রকৃতধর্ম্মভাবে জীবন যাপন করিবার সময় প্রকৃত ন্যূনতা লক্ষিত হয়। তাহার কারণ, গ্রন্থরাশি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিপক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে, অপর এক আত্মার শক্তিসঞ্চার আবশ্যক। যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মার শক্তিসঞ্চার হয় তাহাকে গুরু বলা যায়। যিনি শক্তিসঞ্চার করিবেন তাঁর এই শক্তি থাকা আবশ্যক। আর যাহাতে শক্তি সঞ্চারিত হয় তাহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। ভূমি সুকর্ষিত হওয়া আবশ্যক, বীজও সতেজ হওয়া আবশ্যক। যেখানে এই উভয়টীই বিদ্যমান, সেখানে ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিকাশ। ধর্ম্মের প্রকৃত বক্তা ও আশ্চর্য্য শ্রোতারও সুনিপুণ হওয়া আবশ্যক।

যখন উভয়েই আশ্চর্য্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে। ইহাই ধর্ম্মের যথার্থ প্রতিষ্ঠা, অন্য সকলে ধর্ম্ম লইয়া ধূলি খেলা করে মাত্র। তাহাদের একটু কৌতূহল একটু জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তাহারা এখনও ধর্ম্মচক্রবালের বহির্দ্দেশে রহিয়াছে। যাহা

হইতে আত্মোন্নতি না হয়, তাহা লইয়া ধূলিখেলা করিয়া সময়াতিপাত করা মূর্খতা মাত্র। তবে এ বিষয়ে ঝোঁক থাকা মন্দ নহে, কারণ সময়ে উহা হইতেই প্রকৃতধর্ম্মপিপাসা আসিতে পারে। আর প্রকৃতির এমনই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়, তখনই বীজ আসিবে, আসিয়াও থাকে। যখনই আত্মার ধর্ম্মপিপাসা প্রবল হইবে, তখনই শক্তিসঞ্চারক পুরুষ সেই আত্মার সহায়তার জন্য অবশ্যই আসিবেন। তবে পথে কতকগুলি মহাবিঘ্ন আছে। ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। আমরা নিজেদের জীবনেই ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি। আমাদের জীবনে অনেকসময়ে এরূপ দেখা যায়, হয়ত কাহাকে খুব ভাল বাসিতাম; তাহার মৃত্যু হইল,—আঘাত পাইলাম। মনে হইল, যাহা ধরিতেছি তাহাই হাত ফস্কাইয়া পলাইতেছে, এক্ষণে কোন দৃঢ়তর আশ্রয় আবশ্যক, ধার্ম্মিক হওয়া আবশ্যক। কয়েকদিনেই ঐ ভাবতরঙ্গ কোথায় চলিয়া গেল। আমরা যেখানে ছিলাম সেইখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা সকলেই এইরূপ ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা বলিয়া ভ্রমে পড়িতেছি। কিন্তু যতদিন ক্ষণস্থায়ী এই ভাবোচ্ছ্বাসগুলিকে ভ্রমবশে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা মনে করিব, ততদিন ধর্ম্মের জন্য প্রাণের স্থায়ী ব্যাকুলতা জন্মিবে না। এই কারণে যখনই আমাদের মনে হয়, আমাদের সত্যলাভের জন্য এই চেষ্টা বৃথা হইতেছে, তখন এইরূপ মনে করা অপেক্ষা নিজের অন্তরের অন্তস্তলে অন্বেষণ করিয়া দেখা উচিত যে, হৃদয়ে প্রকৃত আগ্রহ জন্মিয়াছে কিনা। এরূপ করিলে অধিকাংশস্থলে আমরা দেখিব আমরা সত্যগ্রহণের উপযুক্ত নহি, প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা আমাদের হয় নাই।

জীবোদ্ধারের জন্য লোকগুরুর আগমন হইলে আত্মা স্বভাবতই জানিতে পারেন। তিনি উপলব্ধি করেন, যে, তাঁহার উপর সত্যের সূর্য্যালোক পতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সত্য, স্বতঃপ্রমাণ,—উহা প্রমাণ করিতে অপর কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই, উহা স্বপ্রকাশ। উহা আমাদের প্রকৃতির অন্তস্তলে প্রবেশ করে, উহার সমক্ষে সমস্তজগৎ দাঁড়াইয়া বলে ইহাই সত্য। যে সকল আচার্য্যের হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্য সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রতিভাত, তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ মহাপুরুষ। আর জগতের অধিকাংশ লোকেই তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত অল্পজ্ঞানিগণের নিকটও আধ্যাত্মিক সাহায্য পাইতে পারি। কিন্তু

আমরা অন্তরের সহিত যে বস্তু অনুসন্ধান না করি, তাহা পাই না। ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা বড় কঠিন ব্যাপার। উহা আমরা যত সোজা মনে করি, তত সহজ নহে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রাণে ব্যাকুলতা জাগরিত না হয়—যতদিন পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃতির উপর জয়লাভ করিতে না পারি, ততদিন সর্ব্বদা অভ্যাস ও পাশবপ্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম আবশ্যক। উহা দুই এক দিনের কর্ম্ম নহে; কতিপয় বর্ষ বা কতিপয় জন্মেরও কর্ম্ম নহে; শত শত জন্ম ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিতে পারে। সিদ্ধিলাভ কাহারও পক্ষে অল্পকালেও ঘটিতে পারে, কিন্তু যদি অনন্তকালও অপেক্ষা করিতে হয়, তবে ধৈর্য্যের সহিত তাহার জন্যও প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআদ্যনাথ বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ।

যুদ্ধযজ্ঞ।

যুদ্ধসম্বন্ধে প্রাচীন ভারতবর্ষে কতদূর বিশুদ্ধনীতি প্রচলিত ছিল এবং তদনুসারে ভারতের রাজন্যবর্গ কিরূপ প্রণালীতে আপনাদিগকে পরিচালিত করিতেন তাহা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের আর্য্যগণ চিন্ময়ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভে যেমন সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তদনুকূলে যেমন বিবিধ দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিজ্ঞান শাস্ত্রেও তাঁহাদের অসীম পারদর্শিতা ছিল। পণ্ডিতেরা মানবের জ্ঞানকে সম্পাদ্য ও আজানিক এই দুই নামে অভিহিত করেন; অভ্যাস ব্যতিরেকেও যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেমন আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতির জ্ঞান-তাহা আজানিক, আর যাহা অভ্যাসদ্বারা বা শিক্ষালাভদ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা সম্পাদ্য; এই সম্পাদ্যজ্ঞান আবার দুইভাগে বিভক্ত, যথা (১) জ্ঞান ও (২) বিজ্ঞান; পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন "মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।" মোক্ষবিষয়কজ্ঞানই জ্ঞান; আর শিল্প বা বস্তুশক্তি যে

জ্ঞানের বিষয় তাহার নাম বিজ্ঞান এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্র বিজ্ঞানশাস্ত্র নামে কথিত হইয়া আসিতেছে।

মহাভারত হইতে একটী আখ্যায়িকা উক্ত হইতেছে; উহার আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে পঞ্চসহস্র কিম্বা ততোধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও আর্য্যাবর্ত্তবাসী ভারতগণ বিজ্ঞানশাস্ত্রে সমুন্নত ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন; সমরক্ষেত্রে তাঁহারা যে সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহার আলোচনা করিলে জানা যায় যে তাঁহারা বিবিধ রসায়নব্যবহার পরিজ্ঞাত ছিলেন; অস্ত্রদেহেও তাঁহারা বহুপ্রকার ক্ষারসলিল প্রয়োগ করিতেন, ক্ষারসলিলদ্বারা পীত এই সমস্ত অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র আকাশ জ্বলিয়া উঠিত।

এই আখ্যায়িকা মহামতি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উল্লেখ করেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যায় সমাসীন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যেসমস্ত যোদ্ধা সমরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না, যাঁহারা যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধভূমিতে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর কোন্ লোকে গমন করেন। ধর্ম্মরাজযুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ ও প্রবীণযোদ্ধা ভীষ্ম একটী আখ্যায়িকা বলেন।

আখ্যানের মর্ম্ম এইরূপ, রাজা অম্বরীষ স্বকৃতপুণ্যফলে স্বর্গে গমন করেন, তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন যে তাঁহার সেনাপতি 'সুদেব' তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ আসনে অবস্থিত রহিয়াছেন, তখনই তিনি ইন্দ্রকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, সুদেব আমার ন্যায় ধার্ম্মিক যাজ্ঞিক ও পুণ্যাত্মা না হইলেও কিরূপে আমা অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইলেন? ইন্দ্র উত্তর করিলেন তাত! আপনার সেনাপতি সুদেব অনেকানেক সুমহান্ সংগ্রামযজ্ঞ বিস্তার করিয়াছেন। "তিনি আরও বলিলেন" অম্বরীষ, আমি দম্ভ, বৃত্ত, পাক, বিরোচন, দুর্ব্বার্য্য নমুচি, নৈকমায়, শম্বর দৈত্যেয়, বিপ্রচিত্তি, সমুদায় দনুপুত্র ও প্রহ্লাদকে যুদ্ধে নিহত করিয়া দেবগণের অধিপতি হইয়াছি। অম্বরীষ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন" হে শতক্রতো, সংগ্রামযজ্ঞে হবিঃ কি? আজ্য কি? দক্ষিণা কি? ও ঋত্বিগ্ কাহাকে বলে? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন ভারতীয়গণ যুদ্ধকে ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যকার্য্যস্বরূপ বিবেচনা করিতেন; যুদ্ধকার্য্য পবিত্র, যুদ্ধভূমি পবিত্র, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ন্যায্যধর্ম্ম, ধর্ম্মসংরক্ষণের প্রতিকূলে যখন অবশ্যম্ভাবী কারণপরম্পরা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন প্রাণপাত করিয়া সেই ন্যায়,

সেই ধর্ম্ম বজায় রাখিতে হয়, সুতরাং ন্যায্যধর্ম্মসংরক্ষণের যে চেষ্টা তাহাই যথার্থ যুদ্ধ। অতএব প্রাচীনকালের যুদ্ধে কোন ভয়ের কারণ ছিল না, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভারতবাসীর প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত, তাঁহারা ভাবিতেন প্রাণত্যাগ ঘটিলে বহুবিধ সুবিধানপূর্ণ স্বর্গরাজ্যে বাস অবশ্যম্ভাবী। (ক) এইজন্য প্রাচীন ভারতবাসী যুদ্ধকে যজ্ঞস্বরূপে বিবেচনা করিতেন, যজ্ঞে যেমন হবি, আজ্য, ঋত্বিগ্, হোতা, অধ্বর্য্যু স্রক্, প্রভৃতির প্রয়োজন হয় সেইরূপ যুদ্ধযজ্ঞেও কুঞ্জরসকল ঋত্বিক্। বাজিগণ অধ্বর্য্যু পরমাংস হবিঃ এবং রুধিরাদি আজ্যাদিরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

যুদ্ধ বা মহাসমরকে প্রাচীন ভারতগণ মহাসাগররূপেও সময়ে সময়ে কল্পনা করিয়াছেন, যুদ্ধভূমিতে যে সমস্ত মহারথী, অর্দ্ধরথী, অতিরথ প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা সাগরস্থিত তিমিঙ্গিলের ন্যায়; যুদ্ধভূমি এত নিষ্ঠুরদৃশ্য পরিপূর্ণ হইলেও কিরূপে প্রাচীন ভারতগণ ইহাতে আনন্দবোধ করিতেন, তাহা সূক্ষ্মদর্শি পণ্ডিতগণ ভিন্ন অপর কেহ এ তত্ত্ব আলোচনা করিয়া কোনরূপ পূণ্যসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; যুদ্ধভূমি হাহাকারে পরিপূর্ণ; কখন যুদ্ধভূমি অগ্নিময় হইয়া উঠিতেছে, কখন অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, কখন বা জলময় হইয়া যাইতেছে, কখন বা সেনাসমূহ পাশদ্বারা হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবদ্ধ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে,—কখন অস্ত্রপ্রভাবে ঘুমাইয়া পড়িতেছে, কখন বা জৃম্ভন ত্যাগ করিতে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, কখন বা ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে স্বর্গলাভ করিতেছে—এই সমস্তদৃশ্য সতত ঘটিতেছে বলিয়া যুদ্ধভূমি করুণদৃশ্যে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ; তাহাহইলেও যুদ্ধভূমি ধর্ম্মক্ষেত্র; এই ধর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল যোদ্ধা প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সে যাহা হউক এই আখ্যান পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতগণ বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন তাহাও বোধ হইবে; তাঁহারা বিবিধ রসায়ন ব্যবহার পরিজ্ঞাত ছিলেন; তাঁহারা বিবিধ ক্ষারসলিল প্রণয়ন করিতেন, এই সমস্ত ক্ষারসলিল অস্ত্রসমূহকে পান করাইতেন, বা বিবিধ অস্ত্র দেহে প্রয়োগ

(ক) মহাভারতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইন্দ্রমুখে বলিয়াছেন, শূরপুরুষ সংগ্রামে হত হইলে তাঁহার জন্য কদাচ শোক করিতে নাই, কেননা, সংগ্রামহত শূর অশোচ্য হইলে সম্মানভাজন হইয়া থাকেন, সমরহত পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান, উদকক্রিয়া, স্নান ও অশৌচের বিধি নাই।"

করিতেন, প্রাস, শক্তি, পাশুপত জৃম্ভক, প্রস্বাপ, বজ্র, নালিক, শতঘ্নী, প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রব্যবহার প্রচলিত ছিল; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অস্ত্র 'ব্রহ্মাস্ত্র' নামে অভিহিত হইত; এই ব্রহ্মাস্ত্র তড়িন্ময়; মহামুনি দধীচি নিজের সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনাবলে এই তড়িন্ময় অস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা ছিলেন, এবং বিবিধকৌশলে পূর্ণ বজ্রনামক মহাস্ত্রের আবিষ্কার করেন। এই আখ্যানের প্রাসনামক অস্ত্রের বিশেষণগুলি ধীরভাবে আলোচনা করিলে বোধ হইবে যে তাঁহারা অস্ত্রনীতি বা অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ প্রণালীতেও বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতেন; অস্ত্রদেহেও বিবিধ রসায়ন সংমিশ্রণে উহার প্রভাব ও শক্তি আরও বর্দ্ধিত করিতেন;

১। প্রাসনামক অস্ত্রের বিশেষণ

(১) জ্বলন্ত, শাণিত, ক্ষারসলিলদ্বারাপীত প্রাস

(২) শৈক্যায়সময়, সুতীক্ষ্ণ, জ্বলিত, শাণিত প্রাস

২। সায়কের বিশেষণ

(১) চাপবেগে আয়ত, তীক্ষ্ণ, পরকায়াবভেদী,
ঋজু, শাণিত, পীতমহান্ সায়ক

৩। খড়্গের বিশেষণ

(১) দ্বীপিচর্ম্মদ্বারা আনদ্ধ, নাগদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টিযুক্ত,
হস্তিহস্তবিদারী, খড়্গ।

প্রাস নামক অস্ত্র 'শৈক্যায়সময়'—শিক বা বহুবিধ লৌহফলা পূর্ণ; ইহাতে বুঝা যায় এই কুণ্ডাস্ত্র বা ভল্লাস্ত্র নির্ম্মাণে বহুবিধ কৌশলে ব্যবহার করা হইত; উহার লৌহফলা সমূহ শাণযন্ত্রে স্থাপিত হইত উহা ক্ষারসলিল দ্বারা পীত; বহুবিধ ক্ষারসলিল উহাতে প্রয়োগ করা হইত; প্রাসনামক অস্ত্র ক্ষারসলিল (Varicus chemical uanpuritions or compounds) দ্বারা পীত বলিয়া জ্বলিত বা জ্বলন্ত বা উহা নিক্ষেপ মাত্রেই জ্বলিয়া উঠিত।

দ্বিতীয়তঃ মহান্ সায়কের বিশেষণগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় তাঁহারা বিশেষ বিশেষ সুতীক্ষ্ণবাণ প্রয়োগ করিতেন, তাহাতেও রসায়নের সংমিশ্রণ থাকিত; শাণযন্ত্রে স্থাপিত করিয়া ঐ ঋজুসায়ককে সুতীক্ষ্ণ করা হইত; এইজন্য এই প্রকার (ক্ষারসলিল দ্বারা) পীত মহান্ সায়ক ও পরকায়স্থ বর্ম্ম-পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া যোদ্ধাকে বিদ্ধ করতঃ ভূতলশায়ী করিত।

তৃতীয়তঃ খড়্গের বিশেষণগুলিও লক্ষ্যযোগ্য-তাঁহারা কিরূপ সুন্দর তথা সমস্ত মনোনীত করিতেন, সূক্ষ্মশিল্পে কতদূর উন্নত ছিলেন তাহাও বুঝা যায়; প্রাচীন রাজন্যবর্গের তীক্ষ্ণধার খড়্গসমূহ এক আঘাতেই হস্তি-হস্ত বিদারণে সমর্থ হইত; তাঁহাদের খড়্গ সমূহের মুষ্টিস্থান হস্তিদন্তে বিনির্ম্মিত, সুন্দর ও শুভ্র এবং চাকচিক্যশালী; খড়্গের আবরু বা খাপ পবিত্র ও শোচনীয় দীপিচর্ম্মকে (চিত্রব্যাঘ্রচর্ম্মে) বিনির্ম্মিত, ইহাতেই বেশ বুঝা যায় ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজনীতিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা উভয়ের অনুশীলন ও অভ্যাস তৎকালে পরিদৃষ্ট হইত, এবং দেশেও কলাবিদ্ ও শিল্পীর অভাব অপরিদৃষ্ট হইত।

তাহাহইলে দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের ঋষিবাসিগণ যেরূপ জ্ঞানানুশীলনে পারদর্শী হইয়াছিলেন ও তাহারই চূড়ান্ত ফলস্বরূপ যেরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাহারা বিজ্ঞানের আলোকে আধিভৌতিকও আধিদৈবিক জগতের কল্যাণচর্চ্চায় সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞানবলে যে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ বা অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা পুরাকালের ন্যায় উপযোগী ও সম্পূর্ণ নহে। মহামতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন্ বলেন যে তিনি মানুষ মারার পক্ষে নানারূপ কলকৌশল সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার মস্তিষ্ককে ব্যাপৃত করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহেন, তিনি বলেন, সবম্যারিন্ প্রভৃতির পোতপ্রণাশে যে ক্ষমতা এখন দেখা যায় তাহা নিরর্থক করা যাইতে পারে; জর্ম্মানির প্রকাশিত মনুষ্যনাশক বিষময় (গ্যাস) বাষ্প অপেক্ষা ভয়ঙ্কর উপায় বা অস্ত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে; তাঁহার বিজ্ঞানাগারে শতকরা আশীজন জর্ম্মাণছাত্র শিক্ষা বা কাজ করিত; তিনি (মহামতি এডিসন্) তাহাদের আচার ব্যবহারে তাহাদের প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিলেন, মহামতি এডিসন্ এতই স্বদেশভক্ত যে তিনি আমেরিকান্ বলিয়া ও আমেরিকা যুদ্ধসম্বন্ধে নিরপেক্ষ বলিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন নাই; তিনি বলেন (Doveis my emblem) প্রেম, জীবে দয়া অনুরাগই আমার আদর্শ; বর্ত্তমান যুগে রসায়ন ও তড়িতশক্তি বলে কামান ও বন্দুক অপেক্ষা মনুষ্যনাশক নানাবিধ অস্ত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে; একথা তিনি বলিয়া থাকেন এতৎসম্বন্ধে একটী ভদ্রলোকের সহিত এডিসনের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

SCIENCE AND THE WAR.

Edison Reprses to invent means of increasing death roll,

THE TORPEDO.

The great mentor says a way will befound to offset it.

Henry A. Hall has an interesting intervend with Mr Thomas A. Edison, in "The world". The writer chatted with Edison, naturally enongh, mainly on the war, anb the views of the great inrenter on the part sivn is playing and will play in this great conpld make the think furionsly Here is the intervicnd :—

We began to talk about the war, and it was clear how duply Mr Edison was interst-ed. He told me that he had read every phicial document published in connection with the wents bading up to the outbreak of hostitetics.. The would not allow himself to be quoted on the subject, because to use his own words "This my duty as an American to be neutral," but it if was easy to see that he looks upon the struggle as something that goes for deeper than any merely cleeavage, that it is a right to the death between democraey and anto cracy.

But Mr Edison was quite willing to talk about science as applied to warfare. The almost beredless appeal to his wonderful imugination and his bseadth of visien shewed in his answer to my first question. He said :—

"The dove is my unblem".

"Of course science can find much more affeetive ways of destroying life than by artillery and rile fire or the use it high enplosines. The possibilitis of chunistry and electricity have hardly haw tonched upon in modern warifare. They can do a lot better.

"How" I as hed,

"I dont want to say. I went tell"

"Bat do you know of auy thing better ?

অর্ম্মাণি বহুকাল হইতে ভারতের রাজনীতি ও যুদ্ধ বিত্তার আলোচনা করিয়া আসিতেছেন ; তাঁহারা বিমান, পুষ্পক, ব্রহ্মাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, শতঘ্নী, বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন, তাঁহারা অনেকদিন হইতে অস্ত্রদেহে বিবিধ ক্ষারসলিল পান করাইয়া উহাকে মহাশক্তিশালী ও প্রভাবান্বিত

করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, সে চেষ্টা তাঁহাদের কতক পরিমাণে সফল হইয়াছে, অধুনা জর্ম্মাণি ও ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ অস্ত্রকে এই ক্ষারসলিল প্রয়োগে সর্ব্বাপেক্ষা সুপটু, মহামতি এডিসন্ বলিয়া থাকেন যদি পৃথিবী হইতে সমস্ত কয়লা ফুরিয়া যায় আমি এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি, যাহার ব্যবহারে পৃথিবীর সমস্ত লোকের কয়লার আবশ্যকতা মিটিয়া যাইবে ও তাহাতে পৃথিবীর অস্তিত্ব পর্য্যন্তের অভাব হইবে না, মার্কিনাধিবাসী সেই মহামতি এডিসন্ সাহেব বলেন আমেরিকা জর্ম্মাণির সহিত কখনই যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না, যদি আমেরিকা কখন কোন কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে তখন আমি আমার দেশের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে এরূপ অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কার করিব, যাহাতে টরপেডো, সাবম্যারিণের প্রভাব বিলুপ্ত হইবে ও তাহাদের হাতে জাহাজের কোন ভয় থাকিবে না, ইহা আর কিছুই নহে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এডিসন্ এরূপ সমস্ত ক্ষারসলিল অবগত আছেন যে যাহা সুকৌশলে বিনির্ম্মিত বিবিধ অস্ত্রদেহে প্রযুক্ত হইলে উহা যুদ্ধভূমিতে মহাপ্রলয় উপস্থিত করিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

সংবাদ ও মন্তব্য।

হুতাশনে বসন। মহাত্মা গান্ধির অনুমতি হইয়াছে যে "বিদেশীয় বস্ত্র আগুণে পোড়াইতে হইবে। উহা অপবিত্র। অপবিত্র দ্রব্য দান করিলে গ্রহীতার অপমান করা হয়। উচ্ছিষ্ট অন্ন প্রদান করিলে লোককে ঘৃণা করাই হয় উহা অকর্ত্তব্য।" যুক্তির মাধুর্য্য স্বীকার করি, কিন্তু এই যে খুলনার দুর্ভিক্ষ পীড়িত সহস্র সহস্র নরনারী বস্ত্র অভাবে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় দিন কাটাইতেছে, ইতঃপূর্ব্বে যে বস্ত্র অভাবে নারীর আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। তাহার কি প্রতীকার কেবল যুক্তিধারাবর্ষণে হইবে? ভ্রাতৃগণ, তোমরা বিলাতী বস্ত্র পোড়াইয়া অগ্নিক্রীড়া করিতেছ, আর প্রতিবেশী ভ্রাতা ভগিনীরা বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ। নিজেরা বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ কর। কিন্তু উহাদিগকে তোমাদের ত্যক্তবস্ত্র দান কর, উহাদের মান ও প্রাণ রক্ষা হউক্। মহাত্মা গান্ধি কি জানেন না যে এদেশে শব-শয্যারও গ্রাহক আছে। এখানে নিমন্ত্রণ

বাটী উচ্ছিষ্ট প্রার্থীদের কাতর আবেদননিবেদনে মুখরিত হয়। এদেশের দৈন্যদারিদ্র্য চিন্তা করিলে একগাছি তৃণও অনর্থক আগুণে দিতে ইচ্ছা হয় না।

তনুত্যাগ। প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় সম্প্রতি তনুত্যাগ করিয়াছেন। ঘটনাটী যদিও এদেশে নহে, বিলাতে, তথাপি ইহাতে দুঃখিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, কারণ যোগেন্দ্রনাথ এদেশেরই কৃতী সন্তান।

ডাকে বিমানের ব্যবহার। বিমানযোগে বিলাত হইতে ভারতে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হইলে ভাল হয় কিনা—ইম্পিরিয়াল্ কন্‌ফারেন্সে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। অনেকে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। মনে হয় জলে স্থলে এতকাল চলিতেছে, এখন অন্তরীক্ষে চলুক্ একটা যুগোপযোগী নূতন ব্যাপার হউক্—অনেকে ভাবিতেছেন। আমরা কিন্তু ব্যয়হ্রাস না হইলে তুষ্ট হইব না।

রুষিয়ায় দুর্ভিক্ষ। রুষিয়ার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। পেটের জ্বালায় লোকে পুত্রকন্যা বিক্রয় করিতেছে—দাসত্বে আত্মসমর্পণ করিতেছে—দেশ ত্যাগ করিতেছে—মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। বলশেভিক্ গবর্ণমেণ্ট লোকের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। বলশেভিক্ গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় যে কার্য্য হইতেছে তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। অন্যদেশের লোকেরা যেরূপভাবে রুষিয়ায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীর প্রাণরক্ষণ করিতে অগ্রসর হইতে চাহেন, বলশেভিক্ গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও সম্মত নহেন। এখন উপায় শ্রীভগবানের রাঙা পায়। রুষিয়ায় এই দুর্ঘটনা পরীক্ষা না প্রায়শ্চিত্ত শ্রীভগবানই জানেন।

দণ্ডে হরতাল। খুলনাপ্রবাসী চর্ম্মপাদুকা ব্যবসায়ী মৌলবী শ্রীযুক্ত বসিরুদ্দিন সাহেব যশোহরে আসিয়া অসংযত বক্তৃতা করায় ধৃত হন, বিচারে তাঁহার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দুইই হইয়াছে। এই উপলক্ষে যশোহরে তীব্রভাবে হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক রোগী ঔষধ পায় নাই। পথ্য পায় নাই। দোকানপাট বন্ধ। বাজার বসে নাই। আগন্তুক লোকেরা অনশনে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে দণ্ডিতের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ পায়, কিন্তু পক্ষান্তরে অনেকের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হয় না কি? ইহাতে স্থানীয় জনগণের লাভ না ক্ষতি?

CO-OPERATION AND NON-CO-OPERATION.
QUESTIONS & ANSWERS.

Parliament and India Office.

(a) The Control of Parliament and of the Secretary of State must only be modified as the responsibility of the Indian and the Provincial Governments to the electorates is increased. No power over provincial governments now exercised by Parliament and by the Secretary of State must be transferred to the Govt of India save in matters of routine administration until the latter is responsible to the electorates.

(b) The Council of India should be abolished, and there shall be two permanent Under-secretaries to assist the Secretary of State for India one of whom shall be an Indian.

(c) All charges in respect to the India Office establishment shall be placed on the British Estimates.

(d) No financial or administrative powers in regard to reserved subjects should be transferred to the Provincial Governments until such time as they are made responsible regarding them to electorates, and until then the control of Parliament and the Secretary of State should continue.

(e) The committee to be appointed to examine and report on the present constitution of the Council of India shall contain an adequate Indian element.

(f) No dissolution of legislature shall take place except by way of an appeal to the electorate and the reason shall be stated in writing countersigned by the Ministers."

The Delhi Congress held in December 1918 passed the following resolution :—

"That this Congress also re-affirms Resolution No 5 relating to selfgovernment passed at the special session of the Congress held in Bombay subject to this that in view of the expression of opinion in the Country since the sitting of the said special session, this Congress is of opinion that so far as the Provinces are concerned full responsible government should be granted at once and that no part of

British India should be excluded from the benefit of the proposed Constitutional Reforms."

The Congress held in December, at Amritsar 1919 passed the following resolution :—

(a) That this Conference reiterates its declaration of last year that India is fit for full responsible government and repudiates all assumptions and assertions to the contrary wherever made.

(b) That this Conference adheres to the resolution passed at Delhi Congress regarding Constitutional reforms and is of opinion that the Reforms Act, is inadequate, unsatisfactory and disappointing.

(c) That this Congress further urges that Parliament should early take steps to establish full responsible government in India in accordance with the principle of self determination,

(d) Pending such introduction this Congress trusts that so far as may be possible, they so work the Reforms as to secure an early establishment of full Responsible Government, and this Congress offers thanks to the Right Honourable Mr. E. S. Montagu for his labours in Connection with the Reforms, It may be noted that Mahatma Gandhi himself took a prominent part in the proceedings, It should not be forgotten that this session was held more than 8 months after Punjab incidents had taken place, The omission of thanks to Lord Chelmsford was due to the Punjab incidents,

With the exception of a few leaders the moderates as a party did not join the Bombay, Delhi and Amritsar sessions. They had their separate Conferences. At the session held at Calcurta in December 1919 the latter passed the following resolution :—

Resolution. IV

While regretting the omission to introduce some measure of responsibility in the Central Government this Conference welcomes the Government of India Act, of 1919 as the first definite and substantial step towards the progressive realisation of responsible Government. This Conference appeals to all sections of the community, European and Indian, officials and non-officials, wholeheartedly to Co-operate for the successful working of the Act.

So you will see that both the parties agreed to work out the Reforms up to the end of the year 1919, Up to that time the difference was not very sharp, At first both agreed to have partial responsibility in the Provinces but wanted to have similar responsibility in the Central Governmet, The Extremists however later on, at Delhi, asked for full responsible govt, in the Provinces and partial

responsibility in the Central Government, And then at Amritsar they asked for full responsible Government but agreed to work out the Reforms as embodied in the Government of India Act, 1919 as a matter of Compromise. So up to December 1919, the Congress was for Co-operation. The release of Messrs Soukat ali & Mahomed-ali & their compact with Mahatma Gandhi may explain the change of front at Calcutta and Nagpur,

Q. The question of Non-Co-operation surely cannot rise if one believes in the sincerity of the British Govt. But when Mahatma Gandhi demands Swaraj or full responsible government immediately, does it not imply that he has lost all faith in the British goverment? And if he has lost all faith in the British Government, is he not justified to adopt Non-Co-operation as a means to the attainment of Swaraj within or without the British Empire by paralysing the government?

A. Even if he does not believe in the sincerity of the British Government, the question whether he is justified in adopting Non-Co-operation as a means to the attainment of Swaraj depends upon its practicality and efficiency.

Q. So far as I have been able to follow Mahatma Gandhi, his Non-Co-operation scheme includes: (1) renunciation of titles by titleholders; (2) renunciation of all honorary offices; (3) Boycott of government Councils (4) boycott of educational Institutions directly, indirectly connected with Government. (5) Suspension of practice by lawyers; (6) establishment of arbitration Courts; (7) introduction of spinning wheels; (8) non payment of taxes (9) Civil disobedience. The last two are to be resorted to if the other measures fail, Nonviolence is the essential adjunct of the whole programme. Do you consider these practical and efficient?

A. Let me take them up one after another.

1. Renunciation of titles :—

I do not know how renunciation of titles will paralyse the British Govt. The machinery of the government will go on as before even if all titleholders would give up their titles. Up to this moment only very few among titleholders have renounced their titles,

Q. Apart from the question of the practicality and efficiency of the renunciation of titles as a means to the attainment of Swaraj (a) Don't you think that titles demoralise both the giver and the recipient? (b) Is it not a fact that Govt, confers titles in expectation

of support of its unjust measures or as a reward for services rendered which are far from honourable ? (c) And don't you think that those who receive these titles put themselves under an obligation to support all govt. measures just or unjust ? (d) Is not the very system of giving titles pernicious ? (e) And are not titleholders as a rule altogether a bad lot ?

A (a) Yes they lead to demoralisation if they are conferred with some ulterior bad motive. But if they are conferred upon persons who have distinguished themselves in some or other walk of life, they may serve as incentives to others to emulate the examples of those who have been thus honoured. So far as I can see Mahatma Gandhi does not object to titles or distinctions in themselves but objects to receiving them at the hands of the British government which he considers Satanic or unholy. He himself was decorated with a Kaiser-i Hind gold medal on account of his services to the State in South Africa during the Boer War which he returned a few months before the Special Calcutta Session of the Congress in September 1920, I am not aware of his having objected to be called "mahatma" by the people ; perhaps he does not consider the source to be polluted. There are and there may be people who do their duty for the sake of duty alone and even such men will consider it discourteous or ungentlemanly on their part to refuse honours conferred upon them by the Sovereign and thus earn a cheap popularity with some people, if the Government for the time being is in bad odour with them. Some of them may decline such honours as being embarrassing or burden some and unsuited to the particular lines of life they may be following. There may be others who may do some deserving acts with a view to being honoured, though it is very difficult to prove men's minds and it is not unoften that we do injustice to others by attributing motives to them which may not really exist. Take for instance the case of a wealthy man who found a school or a dispensary or a dharmasala or constructs a road or digs a tank for public benefit, and the Sovereign honours him by conferring a title upon him. It may be that he had the idea of honour before his eyes or he had not, but the public are benefited all the same. In such cases, it is impossible for the Sovereign or his Representative to find out what his real motive was and nobody can blame him, if he recognises the charitable gift and honours the donor. In honouring deserving persons, the Sovereign represents the people and gives effect to their wish express or implied. There may be cases of honours

being misplaced intentionally or unintentionally but no human institution is perfect and even in free countries many instances may be found of honours having been conferred upon undeserving men. In democratic countries such as France or America, titles are not conferred upon any person howsoever high their position and howsoever distinguished their services to the State. But though titles are not conferred there are other methods for conferring honours. So titles cannot be said to be demoralising, if they are discriminately conferred.

(b) It is not a fact that Government confers titles in anticipation of services to be rendered. But it may be that they are occasionally conferred upon undeserving persons. But the recipients of such honours are immediately condemned by public opinion and honours in such cases prove more a source of torment than of pleasure to them. Titles in such cases are more or less brands of dishonour and are taken as such by the public. But counterfeit coins may sometimes pass as genuine ones. No human institution can be perfect.

(c) It all depends upon the recipient the Sovereign makes no condition. Honours once conferred are not taken away except in extreme cases where the recipients behave themselves in a manner utterly unworthy of themselves, Honours are not taken away even if the recipient opposes even good Government measures.

(d) The system of conferring titles can by no means be called pernicious. In this phenomenal world of ours there must always be distinctions. People always praise or blame good or bad qualities in their fellow beings, And the Sovereign in honouring deserving men only gives efect to the wishes of the people. The Sovereign may however, now and then abuse the privilege as I have already said. But such abuses gradually diminish with the growth of sound public opinion. You cannot condemn the system of the administration of justice. Even if in some cases the guilty are acquitted and the innocent punished.

(e) Take for instance the case of Bengal alone : If men like late Rajah (Dr,) Rajendralal, late Rai Kristodas Pal, Sir Romesh Mitter, Sir Chandramadhav Ghose, Sir Taraknath Palit, Sir Rashbihary Ghosh, Sir Gooroodas Banarjee, P. Iswar Ch. Vidyasagar C. I. E., Rai Dinabandhu Mitter, Rai Bankim Ch. Chatterjee C. I. E, Romesh Ch. Datta C. I. E., Bhudev Mukherjee C. I. E , Rai Narendranath Sen, Sir P. C. Roy, Sir J. C. Bose, Sir Nilratan Sarkar, Sir D. P. Sarbadhicary, Sir Asutosh Mukherjee, Sir Asutosh Chawdhury, Maharaja Sir Manindra Ch. Nandy Bahadur, Raja Peary mo

Mukerjee,—not to mention other names—men who have distinguished themselves in different walks of life—are a bad lot, I do not know where you can find a better lot

Q. Will you please tell me why the late Mr. Gokhale declined to accept a knighthood? Was he not one of onr greatest public men?

A. The late Mr Gokhale was a C. I. E. and that shows that he did not consider it wrong to accept an honour. I am sure he never thought of it but at the same time he did not consider it proper to throw it away when it was conferred. The Morly Minto Reform Scheme was considered unsatisfactory by the people. But as it was a distinct advance in the way of our political progress, he made up his mind to support it on the principle of "half-a-loaf is better than no bread" and so he thought that his acceptance of a knighthood might mar his usefulness with the public in succesfully inducing them to accept what was given rather than to non-co-operate with it and make it a failure. He was in this frame of mind when he came somehow or other to know that a Knighthood was going to be coferred upon him and he prayed to the Govt. to be excused, It was an act of policy with an eye to the good of India's political progress.

Q. Are recipients of titles consulted before titles are conferred upon them?

A. No. So far as I know as a General rule they are not consulted. But there may be some exceptions to the General rule. The would-be recipients may however sometimes come to know of it; for the most secret news sometimes leak out of Govt. offices. I know many cases in which titleholders would have humbly begged the Govt. to excuse them, if they had known that they were going to be honoured They however did not decline as they did not like to be discourteous.

Q. Do you approve of the conduct of Sir Surendra nath Banarjee in accepting a knighthood?

A. It is rather unsafe to pass opinion about public men who are still in the midst of their activities, but so far as Sir Surendranath is concerned the matter has been already discussed *ad nauseuns* in the Press. I think I shall not be guilty of any impropriety in passing an opinion on it Just at the present moment the Govt of India is in bad odour with the people on account of the injudicious if not perverse handling of the Punjab riots by the civil and military officers

concerned and a certain section of the politicians have spared no pains to discredit the Govt. as much as possible in the eyes of the people. Though Sir Surendranath had like other leading public men condemned the Punjab measures, he did not approve of the policy of Non-Co-operation and made up his mind to Co-operate with the Govt. in carrying out the Reforms recently introduced even at the risk of unpopularity. He had also agreed to accept a ministership. He had cut off his connections with the Congress which cast off old constitutional moorings. Naturally he become unpopular with a particular section of the public. Politics everywhere receive their local tinge due to personal jealousies and those that had no liking for and were jealous of him for his preeminent position in the political world of India, eagerly seized this opportunity for vilifying him to their hearts content. I do not think he has done anything wrong in not having declined the honour bestowed on him. Even if he had declined it, his enemies would have all the same kept up their chorus of abuse on the ground that by this act of apparent self abnegation he wanted to earn cheap popularity and restore to himself his previous position in the political world. If he was really consulted, it is doubtful whether he has acted wisely in not having declined it and followed the example of late Mr Gokhale in a similar situation; though even then he was not likely to escape uncharitable remarks at the hands of his maligners. The honour done to him was an honour done to his public services as a journalist & politician I stongly disapprove of the uncharitable motivies that have been attributed to him, and I am free to say this as I do not claim any personal friendship or political comradeship with him. Rai Bahadur Kristodas Pal C. I. E. who always used strongly to criticise the Govt. whenever it went wrong was honoured with a Rai Bahadurship and C. I. E. and by honouring him the Govt. also similarly honoured his public services as a journalist & politician.

Q. Have not Sir Rabindranath Tagore and Sir Subramania Iyer given up their titles ?

A Yes ; Sir Rabindranath Tagore has given up his knighthood but only as a protest against the oppresive acts of the civil and military officers in administering Martial Law in the Panjab. But so far as I am aware men as eminent as he such as Sir Jagadis Bose. Sir P C Roy, who have distingnished themselves in the scientific world Iust as Rabindranath Tagore has done in the literary world did not renounce their titles. Rabindranath has not, so far as I know,

thrown himself on the side of Non-co-operation ; and if I remember aright, he was for having Mr. Montagu as our Viceroy. And Mr. Montagu has been strongly condemned by Non-co-operators for not having redressed the Punjab wrongs. This act of his clearly showes that he is not a Non-Co-operator.

Sir Subramania Iyer as you know wrote a strong letter to ex-President Wilson of U. S. A. depicting the evils of British administration rather in high colour. The occasion was the internment of Mrs. Annie Besant and two of her followers. When Mr. Montagu came here for preparing a scheme of Reforms along with Lord Chelmsford he took Sir S. Iyer severely to task for having written that letter to the President of a foreign State on the ground that the step was unconstitutional and that he had highly exaggerated the defects of of the British Govt. and further that his object was to prejudice the American public against England who was then in need of American good will and help. That was the reason why Sir S. Iyer gave up his knighthood, Sir S. Iyer is not a non co-operator ; on the other hand, he has condemned the movement.

Q. What do you think of the renunciation of honorary offices ?

A. The honorary offices include such offices as Hony Magistrateship Hony. Munsif and Judgeship, Municipal Commissionership, Presidentship of Punchayets, membership of District Boards and Union Committees, Jurorship, assessorship etc.

Municipalities and District Boards have now been almost completely handed over to nonofficials and that is a step towards Swaraj. The Union Board as constituted in Bengal will now be able to decide even petty civil and criminal cases of the villages under them other provinces are going to hav e similar acts.

The jurors decide sessions cases and their verdict can be set aside by the High Court only on the ground of perversity. Veryseldom do the High Courts interfere with the verdict of the jurors. The institution of jury is virtually an institution of judicial Swaraj. Assessors whose opinion is not binding are gradually being replaced by jurors everywhere. Hony. Magistrates if properly selected are by reason of their local knowledge can do better judicial work than the stipendiary officers. The Presidents of Punchayets also do valuable work in the villages.

(Continued.)

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৮ বর্ষ, ২৮শ খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আশ্বিন।

১৩২৮ সাল।
১৮৪৩ শকাব্দা

পঞ্চমকার সাধন।

সাধিছে সাধক মকার পঞ্চ স্থির করি প্রাণমন;
ব্রহ্মরন্ধ্রে ক্ষরে সুধা পিয়ে ভোর সর্ব্বক্ষণ।
মা-হ'তে নির্গত বচন-অংশ ভোজন করিয়া পরে
মৌনদ্বয় যোগী মাংসসাধনে ঈশ চরণ স্মরে।
গঙ্গা-ঈড়া পিঙ্গলা-যমুনা বিচরে যে মীন ঐ নীরে
সযত্নে সেই মীনদ্বয়ে সাধে যোগী ধীরে ধীরে।
শিরোপরি সহস্রদল স্থিত কর্ণিকার সনে
পারদ উজ্জ্বল মুদ্রা আত্মজ্ঞান লয় মনে।
জীবাত্মারে পরমাত্মায় মিলন করিয়া শেষে
পরমমৈথুনানন্দ যোগী ভুঞ্জে হেসে হেসে।

শ্রীপশুপতি সরকার।

লক্ষ্মীপূজা বা লক্ষ্মীলাভ।

লক্ষ্মীপূজা। আমরা পার্থিব ধনসম্পদলাভের জন্য "লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকি। আমাদের সাধারণতঃ বিশ্বাস "লক্ষ্মীপূজা" করিয়া পার্থিব নৈবেদ্যাদি উপহার উপকরণযোগে পূজা করিয়া 'মা লক্ষ্মীর' প্রসন্নতাসাধন করিতে পারিলে আমাদের পার্থিবসৌভাগ্যোদয় হইবে। আমরা অধিকাংশই অন্তর্মুখীনসাধনা বিস্মৃত হইয়া জড়ের ন্যায় পড়িয়া আছি, মূঢ়তাময়ী জড় অর্থাৎ তামস,—বিস্মৃতিবশে বহিঃপূজা করিয়া অভীষ্টলাভের বাঞ্ছা করিতেছি।

- প্রতিমায় ভাবপ্রতিষ্ঠা করিয়া ধ্যান পূজা উপাসনা স্তবস্তুতি দ্বারা সেইভাব আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া আত্মোন্নতিলাভের জন্য সাধনা করাই যে প্রতিমাপূজা, অর্থাৎ বহির্মুখীনপূজা করার উদ্দেশ্য, তাহা আমরা যেন বিস্মৃত হইয়াছি বলিয়াই সাধারণতঃ মনে হয়।

পার্থিব ঐশ্বর্য্য সম্পদলাভ করিতে হইলেও যে আপনার 'স্ব' কে অর্থাৎ Self কে অপার্থিব ঐশ্বর্য্যসম্পদে ভূষিত করিতে হয়। দৈন্য দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে যে "মনের" দৈন্যদারিদ্র্য ও লাঘবতা দূর করিয়া সদ্ভাব সদ্গুণে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় তাহা কেন আমরা বিস্মৃত হই?

আমরা "কর্ম্মবাদী অদৃষ্টবাদী" আমরা "কর্ম্মফল" মানি, মূঢ়ের ন্যায় কাহার উপর অদৃষ্টের উপর বরাত দিয়া মাথায় হাত দিয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকি কেন?

কর্ম্ম ত আমারই, সৎ হউক অসৎ হউক জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আত্মকৃত কর্ম্মেরই ত ফলভোগ করি। কর্ম্মবৃক্ষ আমিই রোপন করি, কর্ম্মফল আমিই প্রাপ্ত হই। বাসনানুরূপ কর্ম্মের গতি প্রাপ্ত হই, কিন্তু সে বাসনাও ত আমারই বাসনা। আমি আমার বাসনার দ্বারা এবং বাসনানুরূপকর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মগতি প্রাপ্ত হই। স্রোতের তৃণখণ্ডের ন্যায় প্রবাহমুখে ভাসিয়া ভাসিয়া স্রোতজলের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া "তৃণখণ্ড" যেমন আবর্ত্তমধ্যে ঘুরপাক খায় অথবা দৈবযোগে তীরেও উঠিয়া লুটাইয়া পড়িতে পারে। তদ্রূপ আমি আত্মবিস্মৃতিবশতঃ কর্ম্মপ্রবাহে কালস্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া কেন ক্লিষ্ট পিষ্ট হই। সন্তরণপটুর ন্যায় আপনার গন্তব্যস্রোতাভিমুখে বা স্রোতের প্রতিকূলে আত্মপরিচালনা করিয়াও কুল কিনারা পাওয়া যায়?

আমরা দৈবনির্ভর করি। দৈব অনুকূল হইয়া আমায় আমার অভীষ্ট প্রদান করিবেন। যেন আমি কি আমার কেউ নই। আমার দেবতাকে আমার দেবাদিদেবকে, আমার আত্মচৈতন্য জীবচৈতন্যকে বিস্মৃত হইয়া (ঘরের ঠাকুর স্ব আত্মা) আমি কোন দেবতার প্রীতিও আশীর্ব্বাদ আকর্ষণ করিবার আশা করিতে পারি? আমার ঘরের ঠাকুরকে তুচ্ছ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরের ঠাকুরের ভরসায় পড়িয়া থাকিয়া কিরূপে অভীষ্ট সাধন করিতে পারিব বুঝিতে পারি না।

ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে "Heaven help their who help themselves" you তার মর্ম্ম এই বুঝি, যে তোমার "স্ব" অর্থাৎ জীবাত্মাকে মুক্ত কর জীবাত্মার উদ্ধারের জন্ম শ্রেয়ঃ বা প্রেয়ঃ লাভের জন্য তোমার আত্মাকে উপযুক্ত কর, ঈশ্বর তোমার সাহায করিবেন। অথবা মহাশক্তির সাহায্য লাভের জন্য আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ কর। আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করিবার জন্য মহাশক্তির সাহায্য পাইবে। যেমন কম্পাসের কাঁটা চুম্বক লৌহের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা কম্পাসের দিঙ্‌নির্ণয় হয়। কম্পাসের কাঁটা চৌম্বকাকর্ষণে একদিঙ্মুখী হইয়া থাকে। নাবিক তদনুসারে সকল দিকই নির্ণয় করিয়া লয়। তেমনি জীবাত্মাকে শ্রেয়ঃ বা প্রেয়ঃ লাভের জন্য একদিঙ্মুখী করিয়া পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মশক্তিলাভের জন্য "আত্মস্থ" অর্থাৎ আত্মা স্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া অভীষ্টলাভের জন্য যত্ন করিতে হইবে।

পার্থিবসম্পদলাভও অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। পার্থিবতা অর্থাৎ ইহ জগতের সুখসম্পদ ঐশ্বর্য্য লাভ ও ভোগ না করিয়া সাধারণতঃ জীবত্মা পরমার্থিক মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিলে বিড়ম্বনা লাভ হয় ইহাই আমার বিশ্বাস।

কত জন্মজন্মান্তরের বাসনা প্রমত্ত; ভোগজন্যও জীবাত্মা কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসক্তি ভোগবাসনায় মুগ্ধ ও বিড়ম্বিত হইয়া রহিয়াছে। সে সকল বাসনায় মুগ্ধ না হওয়া কথার কথা নয়। চপলচিত্ত বালক যেমন বালস্বভাবে যেটা সুন্দর সুন্দর দেখে তাহাই লইতে ইচ্ছা করে। কিছু কিছু বালকের বাসনা না বিগড়াইয়া কেবলই যদি শাসন তিরস্কার করা যায় অথবা যদি "ভাল নয়" "লইতে নাই" "খাইতে নাই" প্রয়োজন নাই বলিয়া প্রবোধ দেওয়া যায় তাহাতে যেমন বালকের মন প্রবোধ মানে না, রোষতাড়নাভয়ে বালক ক্ষান্ত হইলেও মন ক্ষুব্ধ হয়, ও কাম্যলাভের জন্য ব্যাকুল হয়। বালকের

চাপল্য অপেক্ষাও চপল "মনকে" কেবল প্রবোধদ্বারা ভোগবাসনায় নিবৃত্ত করা যায় না। বলপূর্ব্বক মনোবিরোধ করিয়া প্রবৃত্তির নিবৃত্ততা লাভ সহজে হয় না।

পার্থিববাসনা প্রমত্ত মানব; পার্থিব কাম্যলাভে অসামর্থ্যহেতুপ্রযুক্ত; অথবা অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় বিফলমনোরথ হইয়া অনেক সময় ইংরাজী প্রবচনের দ্রাক্ষাফললোলুপ শিয়ালের ন্যায় "Grapes are sure" বলিয়া সংসার-বিরক্ত হইয়া কেহ ২ বৈরাগ্য ভেক গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতেও; এরূপভাবের ক্ষয়বাদ বৈরাগ্যাশ্রয়ীর প্রকৃতবৈরাগ্য লাভ হইয়া বাসনা সংযত অথবা বাসনামুক্ত হইয়া "নির্ব্বাণ" লাভ হয়? হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র গীতা, চণ্ডী, প্রভৃতি সকলশাস্ত্রই মোক্ষমার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু দেখা যায়, গীতার উপদেশ নিষ্কামকর্ম্ম, মানবকে অনা-সক্তভাবে কর্ম্মময়জীবনযাপন করিতে উপদেশ দিতেছেন। কর্ম্মফল শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিয়া মানসস্থিত মানবের অন্তরস্থচৈতন্যকে শ্রীভগবানের নিয়োগ অনুসারে তাঁর উদ্দেশ্য বুঝিয়া চলিয়া মানবীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গে সংসারভোগবাসনালোলুপ প্রমত্ত মানবের পক্ষে গীতোক্ত মানবজীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহ করা কি এত সহজ?

তাহা নয় বলিয়াই পার্থিবভোগবাসনাপ্রমত্ত সংসারপ্রবৃত্ত জীবাত্মা সাংসারিক ভোগবাসনা প্রাপ্তির জন্য সাধনোপদেশ স্বরূপ "চণ্ডীতে" স্বর্গলাভ যে মানবের যাবতীয় ভোগবাসনা অর্থাৎ মানব যাহা কিছু ভোগবাসনা চাহে, সেই সমস্ত ভোগপ্রাপ্তির জন্য মহাশক্তি, ভোগ ও মোক্ষদাত্রী ভগবতীর নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, সর্ব্বসৌভাগ্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য, কল্যাণ, বিপুলশ্রী, বল, বিদ্যা, যশঃ, লক্ষ্মীমান্ হইবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, এমন কি ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।" বলিয়াও প্রার্থনা করা হইয়াছে। রূপ, জয় ও যশঃ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভোগবাসনা প্রমত্ত সংসার প্রবৃত্তমানব, ভোগপ্রাপ্তির জন্য কাম্যফল লাভের অভিলাষী হইয়া মহাশক্তির নিকট আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করিয়া, কাম্যফল লাভের জন্য সাধনায়, কাম্যফল শ্রেষ্ঠতরভাবে ভগবতীর প্রসাদ-স্বরূপে লাভ করিয়া, ভোগবাসনা চরিতার্থ করিয়া, মোক্ষমার্গগামী হইবার জন্য চণ্ডীতে ও অন্য শাস্ত্রে ব্যবস্থা লিখিত আছে।

"ন যাতু কামঃকামানাং উপভোগেন শাম্যতি" কাম কামনা উপভোগে শান্ত হয় না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় আরও কামনায় প্রজ্জ্বলিত হয় ইহা সুনিশ্চিত।

কিন্তু ভোগস্পৃহার উদ্দামতা নিবারণ না করিলে, ভোগবাসনা সংযত করিবার জন্য "মন"কে লওয়াইয়া নিবৃত্তিমার্গাভিমুখীন না করিয়া কেবল উপভোগমাত্রদ্বারা নিবৃত্তির আশা করিলে উক্তরূপবিড়ম্বনা অবশ্যই হয়। উপভোগের দ্বারা বাসনা শান্ত কদাচ হয় না।

কিন্তু আত্মসংযত করিয়া আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধকরতঃ সাধনলব্ধ মহাশক্তি ভগবতীর প্রসাদলব্ধ ভোগ আস্বাদ চরিতার্থ করিয়া নিবৃত্তিমার্গাশ্রয়ী জন্মান্তর নিবৃত্তির জন্য ঐকান্তিক লোলুপ হইয়া শুদ্ধচিত্তসাধক পারমার্থিক মুক্তিলাভ করিবার জন্যই তন্ত্রাদিশাস্ত্র সাধনোপায় নির্ণয় করিয়াছেন। অবশ্য মুক্তিসাধনাও শাস্ত্রোক্ত যে উপায়ে লাভ হয়, ঘোরতরবন্ধন ও আবার সাধনপথেই লভ্য হয়। সুতরাং অধিকারিভেদে বন্ধন ও মোক্ষ মানবের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং "স্ব" (Self) অধীনে মানবৃত্তি স্থাপন করিয়া স্বাধীন অর্থাৎ আত্মশক্তি উদ্ধার করিয়া "স্ব-স্থ" হইবার প্রয়োজন।

এইজন্যই "রূপং দেহি, জয়ং দেহি যশো দেহি" ইত্যাদি প্রার্থনা প্রতিপদে পদে করা হইয়াছে। আমার প্রকাম্য ভোগলাভ যেন শ্রেষ্ঠ হয়, যেন তাহাতে আমার নীচত্বাস্পর্শ না করে, ভোগের নিকট হইতে ভোগ সেবার জন্য ভোগ প্রার্থনা না করিয়া, লোভের নিকট লোভ চরিতার্থতার জন্য লুব্ধত্ব প্রকাশ না করিয়া, কামের নিকট কাম প্রার্থনা না করিয়া অর্থাৎ এক কথায় লুব্ধত্ববশতঃ ভোগাধীন না হইয়া, মহাদেবীর প্রসাদলব্ধ ভোগ, আত্মশক্তি জাগ্রতকরতঃ লাভ করিয়া, ভোগ, ভোগ করিবার জন্য এবং ভোগাবসানে ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া ত্যাগ করিবার শক্তিতে, ভোগ করাই বাঞ্ছনীয়।

ভার্য্যা সহধর্ম্মিনী, সুতরাং মায়ের নিকট (অর্থাৎ ভগবতীর নিকট) প্রার্থনা করা হইতেছে "ভার্য্যাঞ্চ মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিনীম্।" আমার মনোবৃত্তির অনুসারিনী মনোরমা ভার্য্যা দেও মা। এরূপ প্রার্থনা করিতে হইলে এবং এরূপ প্রার্থনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, সাধককে তদুচিত উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে? সুতরাং সাধক মনোবৃত্তি জয় করিয়া, অর্থাৎ জীবাত্মা, মানসাধীন ভাবে, মনোবৃত্তি চালিত হইয়া না থাকিয়া জীবাত্মার

অধীনে মনোবৃত্তি চালিত করিয়া মানসবৃত্তি উন্নত অর্থাৎ শুদ্ধ করিয়া তবে মনোবৃত্ত্যানুসরিনী মনোরমা ভার্য্যালাভ করিতে হইবে।

আমার মনোবৃত্তি অর্থাৎ Association যেমন হইবে আমার সহগামী বা গামিনী হইবার জন্য তেমনি সকল আত্মাই ত আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু সহধর্ম্মিনী হইয়া আমার সঙ্গ করিবেন? এত সাধারণতঃ আমাদের নিত্য দৈনন্দিন জীবনেও দেখা যায়। আমার প্রবৃত্তি অনুসারে আমার "সঙ্গ" লাভ হয়। যখন যেরূপ আমার রতি, মতি, প্রবৃত্তি, তখন সেইরূপ সঙ্গলাভের বাসনা উদয় হয়, এবং রতি, মতি, প্রবৃত্তি অনুসারে আমার তদ্রূপই সঙ্গ লাভ হয়। বহির্জগতেও যেমন সর্ব্বদা আনন্দলাভ করিতেছি, অন্তর্জ্জগতের বিধানও তাহাই। আমি যদি নিকৃষ্টতম বাসনানুগত হই, আমার মনোরমা মনোবৃত্ত্যানুসারিনী ভার্য্যা লাভ কিরূপ হইবে? আমার সহধর্ম্মিনীলাভ কিরূপ হইবে? সাধারণতঃ যাহা হয় তাহাই হইবে। অর্থাৎ নিকৃষ্টবাসনানুগতা হইবে।

আমাদের দেশে একটা ডাকের কথায় আছে "স্ত্রী ভাগ্যে ধন।" স্ত্রীকে লক্ষ্মীস্বরূপিনী বলা হইয়াছে।

আমার সংসার (World) আমিই যে রচনা করিতেছি। আমিই পুরুষ, আমিই স্ত্রী, আমিই পিতা আমিই পুত্র, আমিই ভ্রাতা আমিই ভগ্নী। আমি এক আমিই বধূ। আমিই আমাকে বহুধা বিভক্ত করিতেছি। আমি দ্বন্দ্ব, আমি নির্দ্বন্দ্ব, আমিই দ্বন্দ্বাতীত।

আমি জীবস্বরূপে পুরুষ, আমি মানস স্বরূপে প্রকৃতি। এই পুরুষ প্রকৃতি-রূপে আমার মধ্যে আমিই আমাকে বিস্তার করিয়া বাসনানুসারে সংসার রচনা করিতেছি। বাসনানুগত হইয়া জলবুদ্বুদের ন্যায় আমি আমাকে অসংখ্যরূপে সৃষ্টি করিতেছি। আমিই আমাকে ভোগ, উপভোগ করিতেছি। কখন আমার মানস আমায় উপভোগ করিতেছে, কখনও আমি আমার প্রকৃতি-স্বরূপিনীমানসকে ভোগ করিতেছি। সেই জন্যই মনোবেগাধীনভোগকে শাস্ত্র বলিয়াছেন বলিয়াই মনে হয় "ন যাতু কামঃকামানাং উপভোগেন শাম্যতি।" প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি মনেরই অবস্থা। মন জীবাত্মাকে ভোগ—উন্মত্ত করিয়া ভোগে প্রবৃত্ত করায়। আবার জীবাত্মা মনকে সংযত করিয়া আপনার অধীন করিলে, মনোবৃত্তি জীবের অনুগত হইলে, জীব যাহা উপ-

ভোগ করেন, তাহা শ্রেষ্ঠভোগ এবং উহা ভোগে ও ত্যাগে জীবাত্মার স্বাধীনতা থাকে।

সুতরাং মন আত্মার (জীবাত্মার) সহধর্ম্মী হইলে জীবাত্মা শুদ্ধাবস্থায় উন্নতমানসসম্পন্ন হইবেই, সুতরাং মনোরমা মনোবৃত্ত্যনুসারিনী ভার্য্যাও হইবেই। সেই ভার্য্যাই লক্ষ্মী-স্বরূপিনী "শ্রী" পরমাত্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর অংশ সম্ভূতা ত হইতেই হইবে।

জীব মানবরূপে "মানসযোগে" অর্থাৎ বাসনানুগত হইয়া জন্মায় এই জন্যই ত (*) মানুষ। জীব, মনুষ্যরূপে পুরুষপ্রকৃতিভাবে মানবদেহে পুরুষপ্রকৃতিলীলা করিয়া সংসারে আত্মবিস্তৃতি লাভ করিয়া, সৃজন-পরিজনশক্তিস্থিতিনাশরূপে বিরাজ করিতেছে। জীব বীজস্বরূপে; মানসক্ষেত্রে আত্মবিস্তারের জন্যই স্থূলশরীরে মানবাদিজীবরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছে। জীব—প্রাণী অজ্ঞানে পতিত হইয়া নানারূপ জীবদেহে পশু প্রাণীরূপে জন্মলাভ করিতেছে। আবার পশ্বাদি অপেক্ষা উন্নততর জ্ঞান ও মানসবল সম্পন্ন হইয়া মানুষরূপে জন্মলাভ করিতেছে।

আবার জীব মনোবৃত্তির শ্রেষ্ঠতানিকৃষ্টতাভেদে দৈত্যদানব রাক্ষস ভূত প্রেত পিশাচ ও দেবাদিলীলা মানবদেহেই অবতারিত হইয়া করিতেছেন। এই মানুষেই দেবতা, এই মানুষেই দৈত্য দানব, রাক্ষস, প্রেত পিশাচের লীলাক্ষেত্র দেখা যায়। নরনারীরূপে জীব নানা লীলারঙ্গ করিতেছেন।

শাস্ত্রেও দেখা যায় উপাসকের প্রকৃতি প্রবৃত্তির স্তরভেদে "লক্ষ্মীও" নানারূপিনী হইয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিতেছেন। লক্ষ্মী, ধনদা, রতিপ্রিয়া, যক্ষী, পিশাচী, প্রভৃতি, পিশাচী সাধনেও ধনলাভ হয়।

কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে "শ্রী" লাভ করিতে হইলে, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। উহাই প্রকৃত 'শ্রী' সম্পদলাভ। উহাতেই মানব শ্রীমান্ হয়। উহাই প্রকৃত সুখসম্পদ। আত্মপ্রকৃতি বশীভূতা করিতে পারিলে অপূর্ব্ব শ্রী সম্পদে সৌভাগ্যবান্ হয়। আপনার মানস উন্নতিতে মানব যথার্থই শ্রী সৌভাগ্যবান্ হয়। ভগবতী তাঁহার বাসনা ফলদাত্রী হন। সাধকের ভোগদাতৃরূপে সৌভাগ্যবিধায়িত্রী ইষ্টাও হন। আবার তাঁহারই অংশ ভোগ্যারূপে সহধর্ম্মিনী ভার্য্যাও হন। এই জন্যই প্রকৃত গুণশালিনী লক্ষ্মী অংশসম্ভূতা রমণীকে লক্ষ্মীস্বরূপিনী ভার্য্যা বলে।

(*) মানুষ man মনুষ্য Name মানসাধীন জীবাত্মা।

দেবকৃত লক্ষ্মীস্তোত্রে উল্লেখ আছে, "ক্ষমস্ব ভগবত্যম্ব ক্ষমাশীলে পরাৎপরে। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে চ কোপাদিপরিবর্জ্জিতে।" ইত্যাদি ২ স্তোত্রদ্রষ্টব্য।—রাজলক্ষ্মী রাজগৃহে গৃহলক্ষ্মী গৃহে গৃহে।"

সৌভাগ্য, মানুষে পুরুষকারদ্বারা, অর্থাৎ আত্মস্থ (Self attainment) হইয়া লাভ করেন। সাধারণতঃ দেখা যায় পার্থিব সম্পদ ঐশ্বর্য্য যাঁহারা উপার্জ্জন করেন তাঁহাদিগকে কৃতী স্বনামধন্য পুরুষ, এবং ইংরাজীতে Self made man বলে। সুতরাং Self অর্থাৎ "স্ব"কে Make অর্থাৎ স্বস্থ করিতে না পারিলে Self made হওয়া যায় না?

আমারই মধ্যে ত্রি-শক্তি ইচ্ছা জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকারূপে বিদ্যমান আছেন। উহাই মহাকালী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী। উহাই বিদ্যা-গুণ-জ্ঞান মহাশক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা চৈতন্যরূপিণী মহামায়া, উহাই মানবের সাধনা, উহাতেই মানবের সিদ্ধি।

বিদ্যা জ্ঞান ও গুণইত মানবের ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ accomplishment, সত্ব-রজঃ তমোভেদে উক্তবিধ ত্রি-গুণাত্মিকা মহাশক্তিমধ্যেইত মানব পার্থিব অপার্থিব ঐশ্বর্য্যলাভ করিতেছেন। উহারই অভাবদৌর্ব্বল্যই ত অজ্ঞান জাড্য মূঢ়তা, দৈন্য দুর্দ্দশা ক্লেশ। নিকৃষ্টতম বৃত্তির আশ্রয়েই ত মানব ক্লেশ প্রাপ্ত হয়।

ভাবেই সব, ভগবতী-মহাশক্তি-মহামায়া ভাবাত্মিকা, ভাবেই মানব পশুত্ব লাভ করে, ভাবেই মানব দেবত্বলাভ করে। সেইজন্যই বলে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" কাম ক্রোধাদিরিপু নিচয়কে ইংরাজীতে Passion বলে। উহাই রিপুনিচয়কে, বিশেষতঃ কামরিপুকে পাশ্চত্যজাতির ভাষায় Brutal Passion বলে। উহার বঙ্গানুবাদ "পশুবৃত্তি।" আর্য্যহিন্দুগণ রিপু-নিচয়কে পশুভাবে গ্রহণ করেন নাই। রিপুপ্রবৃত্তির পাশবিকতায় পশুবৃত্তি; মানবাত্মা নিতান্ত অধম রিপুপ্রমত্ত প্রমাদী না হইলে আর পশুভাব প্রাপ্ত হয় না। আর্য্যগণ রিপুচয়কে দেবতা বলিয়াছেন বলং দেখা যায়। কাম দেবতা, ক্রোধ দেবতা, সকল রিপুরই দেবতা আছেন। কামই অকাম, ক্রোধই অক্রোধ, লোভই অলোভ, ইত্যাদি। একেরই অবস্থাভেদে, বিদ্যা অবিদ্যা, অর্থাৎ জ্ঞান অজ্ঞানভাবভেদে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। জীব রিপুর অধীন হইয়া রিপুসেবা করিবেনা, রিপু জীবাধীন হইয়া জীবের প্রয়োজনানুসারে সেবা করিবে। রাগেরই বিপরীত গতিকে প্রেম। সৎ অসতেরই একটা বিপরীত দিক্।

এবং "সৎ" অসতেরই একটা বিপরীত দিক্। পূর্ব্বে বলিয়াছি রাগের অভাব প্রেম। প্রেমের অভাব রাগ। সতের অভাব অসৎ, অসতের অভাব সৎ। কামের অভাব অকাম, লোভের অভাব অলোভ ইত্যাদি। সুতরাং জীব শুদ্ধ-ভাবে রিপুসেবিত হইলে "পাশবিকতা" বলা কেন সঙ্গত হইবে। ভাষাগত-ভাবে আর্য্য এবং পাশ্চাত্যপ্রকৃতিতে কতটা প্রকৃতিগত পার্থক্য দাঁড়াইয়াছিল। যাহাতে রিপু সম্বন্ধে পরস্পরের ধারণা এতটা বিপরীত দাঁড়াইয়াছিল। Brutal passion, অর্থাৎ পাশবিকরিপুবৃত্তি বলিয়া ইংরাজীতে কথিত হইয়া থাকে। অত্যন্ত রিপুর অধীন হইয়া পড়িলে মানব, মানব-জন্মে ও নিকৃষ্টতমগতি প্রাপ্ত হয়। এমন কি মানব উহার অধীন হইয়া অত্যা-শক্তি বশতঃ ভ্রষ্টজন্ম হইয়া মানবেতর নিকৃষ্টপ্রাণী, এমন কি জড়স্তরেও যাইতে পারে এইরূপ আমার বিশ্বাস। মানবজন্ম বহুযোনি ভ্রমন করিয়া লাভ হয়, হিন্দুধারণানুসারে বিশ্বাস, চতুরশীতি লক্ষযোনি ভ্রমণ করিয়া মানব-জন্ম লাভ হয়। Evolution অর্থাৎ ক্রমোন্নতিক্রমে যদি উত্থান হয়, তবে উত্থান থাকিলে পতনও ত আছে? ভাব (Sentiment) মনের ধর্ম্ম। মন ভাবাধীনে উচ্চ বা অধমতালাভ করে, ভাব প্রকৃতি, ভাবাধীনে মনের অধীন হইয়া জীবাত্মা আত্মপ্রকৃতি লাভ করে। উহাই জীবাত্মার স্বভাব বা প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। উহাই আমাদের জন্মান্তরগতি লাভ করায়, সেইজন্য বলে "স্বভাব যায় না মলে।" উহা হইতে কর্ম্মফল অদৃষ্ট গঠন হয়। মরণেও স্ব-ভাব অর্থাৎ জীব, যেরূপ ভাবাধীনে চালিত হয় সেইভাবের নাশ হয় না। কিন্তু স্ব-ভাব নাশ হয় স্ব-ভাবের দ্বারা এই স্থানে উচ্চভাব ও অধমভাব বলিতেছি, অর্থাৎ "স্ব-ভাব যদি মন্দ হয় অর্থাৎ অসৎ স্বভাব নাশ অর্থাৎ বিদূরিত করিতে হইলে সৎভাবগুলি গ্রহণ করিতে হয়। সৎ-ভাবে চিত্তস্থিতি করিতে পারিলে "অসৎ" যাইয়া "সৎ" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা লাভ করা অনায়াস সাধ্য নহে। সেই জন্যই সাধন সিদ্ধ ব্যাপার সাধনা করিয়া লাভ করিতে হয়। কায়মনোবাক্য বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা নিয়োজিত করিতে হয়। ইহা স্বায়ত্ত অর্থাৎ স্বআয়ত্ত ব্যাপার। বাহিরের দ্বারা সাহায্য লাভ হইতে পারে। সৎগুরু, সৎসঙ্গ, সদালাপ, সৎচিন্তা, ইত্যাদি দ্বারা সাহায্যলাভ হইতে পারে, ইহাতে অন্যথা নাই। কিন্তু Retention Power আকর্ষণ বা গ্রাহীতাশক্তি ত ধারণা করা স্ব আয়ত্ত ব্যাপার।

সুতরাং "সৎ অসৎ" যাহা কিছু লাভ করি উহা আমিই করি, জগতে

সৎও আছে অসৎও আছে, আমার অন্তরেও সৎ ও অসৎ উভয় প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু আমিই সৎ দ্বারা সৎ ও অসৎ দ্বারা অসৎ গ্রহণ করি।

সৎ ও অসৎই হচ্চে "গুণ" সৎ অসৎভেদে সদ্‌গুণ অসদ্‌গুণ বলিয়া উল্লেখ হয়। সুতরাং গুণ ও প্রকৃতি। চলিত কথায় আছে, "মনের গুণে ধন।" মনই গুণযোগে ধনী অধনী হয়।

লক্ষ্মী প্রকৃতি, সুতরাং মানবলক্ষ্মীলাভ করিতে হইলে মানসপ্রকৃতিকে সদ্‌গুণান্বিত হইতে হইবে। সদ্‌গুণদ্বারা প্রকৃতি আয়ত্ত করিতে পারিলে লক্ষ্মীলাভ করা মানুষের স্বায়ত্তসাধ্য ব্যাপার।

সুতরাং সাধারণতঃ দেখা যায় পুরুষকারসম্পন্ন লোকেই জগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। সুতরাং অগ্রে অন্তরস্থিত ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যবাসনা না হইলে বাহিরের ঐশ্বর্য্যলাভ হয় না। এরূপ ব্যক্তিকে পার্থিব ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে ব্যাকুল হইতে হয় না, ঐশ্বর্য্যের পাছে পাছে ছুটিতে হয় না। অদৃষ্ট অদৃষ্ট করিয়া কপাল ঠুকিয়া ফিরিতে হয় না। ভাগ্য ঐশ্বর্য্য উঁহাকে লাভ করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। সামান্য আয়াসে বা অনায়াসে ঐশ্বর্য্যান্বিত হন। কেন না তিনিই স্বয়ংই যে ঐশ্বর্য্য। তাঁহার গুণরূপ বিভূতিই যে তাঁকে অপার্থিবধনে ধনী করিয়া রাখিয়াছে। পার্থিবতা তাঁর কাছে তুচ্ছ, সুতরাং তুচ্ছ যাহা শ্রেষ্ঠের নিকট তাহা স্বভাবতই অধীন।

এরূপ ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তিই ত প্রকৃত সৌভাগ্যবান্ লক্ষ্মীমন্ত। ইঁহারাইত সুখী। সদ্‌গন্ধশালী পুষ্প যেমন আপন সৌরভে আপনি আমোদিত, আপনার রূপে আপনি প্রমোদিত হইয়া আমোদ বিকিরণ করে তদ্রূপ ইহারাও স্বয়ং-সিদ্ধ সুখী ও সৌভাগ্যবান্ হইয়া অপরকেও সুখসৌভাগ্য বিতরণ করেন।

নিকৃষ্টতম বাসনাধীনে, নিকৃষ্ট উপায়, নিকৃষ্ট সাধনায়, কিঞ্চিৎ অর্থ সম্পত্তিলাভ যাহা হয়, তাহার দ্বারা কি মানুষ ধনী হয়? তাহাতে সুখও নাই শান্তিও নাই। উহা কাঙ্গালের পক্ষে যা তা খাইয়া ক্ষুধা মিটানবৎ। তাতেও ক্ষুধা মেটে না। সে কাঙ্গাল, চিরকাঙ্গালই থাকে। তার ইহকালও ভ্রষ্ট পরকালও ভ্রষ্ট, আমরা নাকি নিতান্ত কাঙ্গাল, তাই আমরা যেন তেন প্রকারেণ কেহ কিঞ্চিৎ ধন বা বিষয় অর্জ্জন করিলে তাহাকে ধনী, সুখী বড়লোক ইত্যাদি মনে করি। আমাদের প্রেতশক্তিবশতঃ অজ্ঞানধারণাবশতঃ

এইরূপ ভ্রম জন্মায়। নচেৎ প্রকৃত উহাতে সুখ নাই উহা সম্পদ্ নহে, উহা বিপদ্, উহা ঘোরতর বিপদ্। জীব আত্মায় ধন্ম না হইলে কি মানুষ প্রকৃতপক্ষে ধনী হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বলিদান-সমাধান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গুরু। দেখ বৎস, বিপ্র ও ব্রাহ্মণ শব্দ এইস্থলে সাধারণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সর্ববিধ ব্রাহ্মণবোধক নহে। হীন বা গৌণ ব্রাহ্মণকেই লক্ষ্য করিতেছে, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণকে বুঝাইতেছে। এই ব্রাহ্মণের বিষয় পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এইস্থলে সংক্ষেপে পুনরপি বলিতেছি। অত্রি বলিয়াছেন—

অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভেনির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্রউচ্যতে॥
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥

ব্রাহ্মণের অসবর্ণাগর্ভজাত পুত্রও ব্রাহ্মণশব্দে অভিহিত হইতেন। মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়ে যথা:—

ক্ষত্রিয়ায়াস্তু যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ঃ॥
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাদসংশয়ঃ॥
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্ বৈশ্যায়ামপিচৈব হি॥

বৈধহিংসাধিকারী এই প্রকার গৌণ বা হীন ব্রাহ্মণের ও মত্তাদিপান বিধেয় নহে। ইহাই ঐ নিষেধবিধি হইতে ফলবলে আসিতেছে। কারণ যাহার প্রাপ্তি নাই তাহার নিষেধ হইতে পারে না। ফলকথা কোনক্রমে যাহাদের ব্রাহ্মণসংজ্ঞা হইতে পারে তাহাদিগের ও মত্তাদির অধিকার নাই। ইহাই উক্ত নিষেধের মীমাংসা বলিয়া জানিবে।

"বিপ্রতিষেধো যাদৃগ্‌জাতীয়স্য" যাদৃশ ব্রাহ্মণের বৈধহিংসা বিহিত হইতেছে তাদৃশ ব্রাহ্মণেরই উহার নিষিদ্ধ বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে—

"বিধিরপি তাদৃগ্‌ জাতীয়স্য" এই ন্যায় অনুসারে মুখ্য ব্রাহ্মণের বৈধহিংসাধিকার স্থির হইতে পারে না, কারণ বৃহন্মনু তাঁহাদের বৈধহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে বলিয়াছেন—

"বৈধহিংসা ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা চ রাজসী
ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ॥

এইরূপ মুখ্য ব্রাহ্মণ যে সাত্ত্বিক তাহাও বলা হইয়াছে, এবং এইরূপ ব্রাহ্মণের পক্ষে তারাপ্রদীপ ও যোগিনীতন্ত্র স্পষ্টরূপে বলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

"পঞ্চামৃতং তথা খণ্ডং শাল্যন্নং পিষ্টকং তথা"—ইত্যাদি
এবং বিপ্রাণাং ক্ষীরবলয়ঃ শাল্যন্নং বাথ পায়সম্"

ইত্যাদি আরও দেখ বৎস, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শাস্ত্রবিহিত সাধারণ সংজ্ঞা "দ্বিজ" হইলেও সর্ব্বত্র তাহার ব্যবস্থা স্বীকার করিলে "শূদ্রাণাং সুপকারী চ শূদ্রযাজীচ যো দ্বিজঃ। অসিজীবী মসিজীবী বিষহীনো যথোরগঃ" এইস্থলে অসিজীবী বলিয়া ক্ষত্রিয়েরও নিন্দা করিতে হয়। অস্ত্রজীবিত্বই যে ক্ষত্রিয়ের স্বভাবধর্ম্ম তাহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিলেও স্মরণ করাইয়া দিতেছি "ক্ষত্রিয়স্য নিত্যশস্ত্রতা" "ক্ষত্রিয়োহি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ" ইত্যাদি সুতরাং অপরিত্যাজ্য স্বভাবধর্ম্মের নিন্দা করিতে হয়, তাহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, কারণ "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" ইত্যাদি বহুস্থলে অনিষ্ট ঘটিয়া যায়।

অতএব পশুহিংসায় "বিপ্র বা ব্রাহ্মণ" শব্দে সর্ব্ববিধব্রাহ্মণ কোনক্রমে সিদ্ধান্ত করা যায় না, ঐরূপ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণই বৈধহিংসাধিকারী জানিবে। তাহা না হইলে শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া যায়। কোন বিধি বৃথা বিহিত হয় নাই। দেশ, কাল ও পাত্রের বিচার করিলে কুত্রাপি বিরোধ হইতে পারে না, অন্যথা মহানিষ্ট অনিবার্য্য।

শিষ্য। গুরো, বেশ বুঝিলাম এইস্থলে "বিপ্র বা ব্রাহ্মণ" উক্তবিধ গৌণ বা হীনব্রাহ্মণ, অন্যথা নানাপ্রকার বিপত্তি। কিন্তু মাতৃকাভেদতন্ত্রে দ্বাদশপটলে যে উক্ত আছে—

"পশুদানং বিনা দেবীং পূজয়েন্ন কদাচন"

পশুদান বিনা দেবীকে কখন পূজা করিবে না, তাহার কিরূপ মীমাংসা হইবে।

গুরু। বৎস, পশুদানের অধিকারিক্ষত্রিয়াদির পক্ষে বলি প্রশংসা-সূচক বিধি বলা যায়। ইহা যে উক্ত অধিকারীর অবশ্য কর্ত্তব্য নহে তাহা কতকটা সুরতরাজা ও সমাধিবৈশ্যের ভগবতীপূজা হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা বিনাপশুদানে দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠে তাহা জানিতে পারিয়াছ। দেখ বৎস, পশুদানের অনধিকারী ব্রাহ্মণের পক্ষে পশুর কল্পান্তরদ্বারা পূজাবিহিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার পশুদানের ফল হইবে, ইহা সাত্ত্বিকবলিপ্রকরণে বলিয়াছি। সুতরাং সকল অধিকারীর পক্ষেই প্রকারান্তরে এই ফলের স্বার্থকতা হইতেছে।

শিষ্য। গুরো, নিবন্ধে তৃতীয় পটলে উক্ত আছে—

"বলিদানং বিনা যস্তু পূজয়েত্তারিণীং নরঃ।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাত্তেষাং পশুধিয়াং প্রিয়ে॥

বলিদান ভিন্ন যে ব্যক্তি দেবীপূজা করিবে, হে প্রিয়ে পশুবুদ্ধি তাহাদের জ্ঞান বা মোক্ষ কিছুই হয় না। ইহার কিরূপ মীমাংসা হইবে।

গুরু। বৎস, ইহা যথার্থকথা তাহাতে সন্দেহ নাই, বলিপ্রদান একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা পশুবলি যে সকলের অপরিহার্য্য তাহা কিরূপে বুঝা যাইতেছে। বলি যে সাত্ত্বিক ও রাজসিকভেদে দ্বিবিধ তাহারমধ্যে রাজসবলিই যে বলিশব্দ বাচ্য তাহার ত কোন নির্দ্দেশ নাই, ইহা দ্বারা দ্বিবিধ বলিই বুঝা যাইতেছে এবং তাহাই অভিপ্রায় বলিয়া "বলিদান" শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, এখন অধিকারিভেদে বলিভেদ করিয়া এই উক্তির সার্থকতা বুঝিতে পারিলে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না।

শিষ্য। গুরো পরাশর সংহিতায় কথিত হইয়াছে:—

"পশুযাগং প্রকুর্ব্বাণঃ কলৌ বেদবিদাংবরঃ।
পশ্বাকৃতিং যবাদ্যাদ্যৈঃ কারয়িত্বা স্বমন্ত্রতঃ॥
তত্র প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য তন্মন্ত্রৈ র্বপাকরেৎ।
তেন বিষ্ণুঃ প্রসন্নঃসন্ দদাতীষ্টমনোরথান্॥

বেদবিদ্‌প্রধান কলিতে পশুযাগ অর্থাৎ পশুবলি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে যবাদ্যত প্রভৃতি দ্বারা পশ্বাকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া বা করাইয়া সেই সেই মন্ত্র দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থাৎ যে পশুর যে মন্ত্র সেই পশ্বাকৃতির

সেই মন্ত্রদ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ছেদন করিবে, তাহাতে বিষ্ণু প্রীত হইয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। এইস্থলে "বিষ্ণুই প্রীত হন বলা হইয়াছে অর্থাৎ বিষ্ণুপূজায় এইরূপ বলি প্রদান করা কর্ত্তব্য, শক্তি পূজায় নহে।

গুরু। বৎস, এইস্থলে বিষ্ণু উপলক্ষ্যমাত্র উহা দেবীপূজায়ও বিহিত। কারণ দেখ বিষ্ণুপূজায় জীবহত্যারও বিধি রহিয়াছে যথা কালিকাপুরাণে ৬৭ অধ্যায়ে :—

রোহিতস্য তু মৎস্যস্য মাংসৈর্বার্দ্ধিণসস্য চ।
তৃপ্তিং প্রাপ্নোতি বর্ষানাং শতানি ত্রীণি মৎপ্রিয়া।
নীলগ্রীবো রক্তশীর্ষঃ কৃষ্ণপাদঃ সিতচ্ছদঃ।
বার্দ্ধীণসঃ স্যাৎ পক্ষী চ মম বিষ্ণোরপি প্রিয়ঃ ॥

বরাহপুরাণে ১১৯ অধ্যায়ে যথা :—

মার্গং মাংসং তথাচ্ছাগং শাশং মাংসং তথৈবচ।
এতানি হি প্রিয়াণি স্যুঃ প্রযোজ্যানি বসুন্ধরে ॥

অথবা

মার্গং মাসং বরং ছাগং শাশং সমনুযুজ্যতে।
এতানি প্রাপণে দত্তান্মম চৈতৎ প্রিয়াবহম্ ॥
পক্ষিণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যে প্রযোজ্যা বসুন্ধরে।
লাবকং কার্ত্তিকঞ্চৈব প্রশস্তঞ্চ কপিঞ্জলম্ ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ শতশোহথ সহস্রশঃ।
মম কর্ম্মণি যোগ্যা যে তে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

যোগিনী তন্ত্রে :—

মার্গং মাংসং তথা ছাগং শাললং শাশকন্তথা।
এতৈস্তু প্রাপণে দত্তাদ্বিষ্ণোশ্চৈব প্রিয়াবহম্ ॥

রোহিতমৎস্য ও বার্দ্ধিণসমাংসদ্বারা আমার প্রিয়া তিনশতবর্ষ তৃপ্তি লাভ করেন। নীলগ্রীবা, রক্তবর্ণমস্তক, কৃষ্ণবর্ণপদ ও শ্বেতপক্ষপক্ষীকে বার্দ্ধিণস কহে, তাহা আমার এবং বিষ্ণুরও প্রিয়। মৃগ-ছাগ-শশকমাংস হে বসুন্ধরে আমার প্রিয়। পক্ষিগণের মধ্যে যাহারা আমার বলিরূপে বধ্য হইতে পারে তাহা বলিতেছি, লাবক অর্থাৎ লাবা বা লাওয়া পক্ষী, কার্ত্তিক-পক্ষী প্রশস্ত, কাপিঞ্জল অর্থাৎ চাতক বা তিত্তির এবং অন্যান্য শত

শত শত সহস্র সহস্র পক্ষী আমার কর্ম্ম অর্থাৎ পূজায় যাহারা প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা বলিয়াছি, ইত্যাদি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে বিষ্ণুর জীববলি শাস্ত্রবিহিত, সুতরাং এই পরাশরসংহিতোক্তবচনদ্বারা বিষ্ণু উপলক্ষিত হইতেছেন মাত্র বলা যাইতে পারে। বিষ্ণুর পক্ষে সাত্ত্বিকবলি মীমাংসা করিলে উক্ত শাস্ত্রসমূহ অনর্থক হইয়া পড়ে। আরও বৎস, শক্তিপূজার সাধারণফল বিষ্ণুপ্রীতি ব্রহ্মযামলে আদ্যাস্তোত্রে উক্ত আছে:—

"বিষ্ণুপ্রীতিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা"

অতএব বিষ্ণুর যাহাতে প্রীতি দেবীর তাহাতে প্রীতি না হইবে কেন? ঐ সংহিতাবচন কেবল বিষ্ণুবিষয়ক বলিতে পার না, অতএব শক্তিপূজার ও ঐরূপ বলি অবশ্য স্বীকার্য্য। এই নিমিত্তই তারাপ্রদীপদ্বিতীয়পটলে উক্ত আছে।

সাধকো জীবহত্যাঞ্চ কদাচিন্নৈব কারয়েৎ।
ইক্ষুদণ্ডঞ্চ কুষ্মাণ্ডং তথা বন্যফলানিচ
পিণ্ডক্ষীরৈঃ শালিচূর্ণৈঃ পশুং কৃত্বা দদেদ্বলিম্
তত্তৎকালবিশেষেণ সৎপশুং কল্পয়েৎ সদা।

সুতরাং অধিকারিভেদ স্বীকার না করিলে আর উপায়ান্তর নাই। ভগবদ্বাক্য তাহা হইলে বিফল হইয়া যায়। ইহাও আবার সর্ব্ববর্ণের জন্য একান্ত নিশ্চিত এই সিদ্ধান্ত করিলে "পশুহিংসা" বাধিত হইয়া পড়ে; অতএব সাধকভেদ অনিবার্য্য। এইহেতু পরাশরের এই বচন কেবল বিষ্ণুবিষয়ক মীমাংসা করা যায় না। যদি সাত্ত্বিকবলিই মাত্র বিষ্ণুর বিধেয় হইত, তাহা হইলে ঐ বচনের বিষ্ণুবিষয়ে বিশেষ সার্থক্য থাকিত, কিন্তু তাহাত নহে দেখিতে পাইলে, অতএব এই স্থলে বিষ্ণু উপলক্ষ্য মাত্র।

শিষ্য। গুরো! এই সংহিতোক্ত বিষ্ণু যে উপলক্ষ্যমাত্র, তাহা এখন বুঝিতে পারিলাম, আমার ধারণা ছিল বিষ্ণুবিষয়ে বলিমাত্রই নিরামিষ এখন সে ধারণা দূর হইল। দেখিতেছি সর্ব্বদেবদেবীরই ত্রিবিধপূজা বিহিত। গুরো, উক্ত বচনে "কারয়েৎ" এই ণিজন্ত ক্রিয়াপদের "সাধক" প্রযোজককর্ত্তা বলিয়া স্বয়ং জীবহত্যা যে করিবেন না তাহা ত ভাল বুঝিতেছি না। তিনি জীবহত্যা করাইবেন না—ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তাহা হইলে সাধকের মুখ্যরূপে বর্জ্জন এই বচন হইতে কিরূপে স্থির হইতে পারে?

গুরু। বৎস, ইহা অতি সামান্য কথা, মাত্র ব্যাকরণসাহায্যেও ইহার মুখ্যকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যেমন "কংসবধমাচষ্টে" এই বাক্যে কংসংঘাতয়তি এই মুখ্য কর্তৃগামিণিজন্তক্রিয়া "ঘাতয়তি" হইয়াছে সেই-রূপ "কৃদন্তোপাখ্যানে কৃল্লুক্, প্রকৃতিপ্রত্যাপত্তিঃ, প্রকৃতিবচ্চ কারকম্" এই সূত্রানুসারে জীবহত্যাকরণমাচষ্টে এই বাক্যে "জীবহত্যাং কারয়তি এইরূপ ণিজন্ত কৃধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে। সাধকের মুখ্যভাবে স্বয়ং কর্তৃত্ব স্বীকার না করিলে এইস্থলে "কৃত্বা ও দদেৎ" এই দুই আখ্যাত ও অনাখ্যাতক্রিয়ার কর্ত্তা "সাধক" হইতে পারে না।" সাধক "প্রয়োজককর্ত্তা হইলে "কারয়িত্বা ও দাপয়েৎ" এইরূপ ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইত, তাহা ও হয় নাই, সুতরাং এইস্থলে সাধক প্রয়োজক কর্ত্তা নহে। মুখ্যভাবে সাধকের কর্তৃত্বস্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রীয় বচনান্তর দ্বারা ইহার স্বয়ং কর্তৃত্ব মীমাংসিত হইয়েছে। বৃহন্মনু বলিয়াছেন।

"হিংসাচৈব নকর্ত্তব্যা বৈধহিংসা চ রাজসী।
ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যত স্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ॥"

এই উক্তিও "বিপ্রাণাং ক্ষীরবলয়ঃ শাল্যন্নং বাথ পায়সং ইত্যাদি "পঞ্চামৃতং তথা খণ্ডমিত্যাদি প্রমাণবচনপরম্পরা হইতে অনায়াসে স্বয়ং কর্তৃত্বের মীমাংসা হইতেছে সুতরাং কারয়েৎ" এই ক্রিয়ার আর সন্দেহ থাকিতেছে না। তৃতীয়তঃ অনধিকারীকে ও সাধক এই জীবহত্যা করাইবেন না তাহাও বুঝাইতেছে। এখন বুঝিলে বৎস, শাস্ত্র কেমন সুন্দর নির্ব্বিরোধ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শিষ্য। হাঁ গুরো, এখন বুঝিলাম কেন সাধক আপনি জীবহত্যা করিবেন না বা করাইবেন না বলিয়াছেন। গুরো, গন্ধর্ব্বতন্ত্রে চতুস্ত্রিংশ পটলে—

"ন শস্তং মারণং কর্ম্ম ব্রহ্মাপ্তৌ ব্রহ্মসাধক।
যদা সর্ব্বাণি ভূতানি স্বাত্মৈব পরিপশ্যতি।
সর্ব্বভূতমিবাত্মানং ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা॥

বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম (মুক্তি) প্রাপ্তি যাঁহাদের হইয়াছে, ঈদৃশ ব্রহ্মসাধকের (ব্রহ্মনিষ্ঠের মুক্তের) মারণকর্ম্ম অর্থাৎ হিংসাপ্রশস্ত নহে। যিনি সমস্ত ভূতে ও সমস্তভূত যাঁহাতে, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠেরই মারণকর্ম্ম উচিত নহে। অন্যের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যে তাহাতে অধিকার নাই তাহা ইহাতে ত বুঝাইতেছে না।

গুরু। বৎস, ব্রহ্মনিষ্ঠের শ্রৌতস্মার্ত্ত নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য প্রভৃতি কোন কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা নাই, তাঁহার বলিশূন্য বা হিংসাশূন্য কর্ম্মের অধিকার কিরূপে থাকিতে পারে? যেমন বন্ধ্যার পুত্র, গগনের কুসুম, শশকের বিষাণ, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠের বা মুক্তের বা সর্ব্বভূতাত্মসমদর্শীর মারণাতিরিক্ত কর্ম্ম। সুতরাং "ন শস্তং মারণং কর্ম্ম ইত্যাদি" এই স্থলে সাধারণ সাত্বিকের কর্ত্তব্যনির্ণায়ক এবং "যদাসর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যাদি ঐ সাত্বিকের স্তুতিপর। ইহার প্রকৃত জ্ঞানকাণ্ডান্তর্গত অভিপ্রায় সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী মুক্ত পুরুষ। ইহা কর্ম্মাধিকারী মুমুক্ষু সাত্বিক-সাধকের প্রতি বিহিত বুঝিতে হইবে, তাহা হইলেই ব্রাহ্মণকে বুঝা যাইতেছে।

শিষ্য। গুরো, ইহা ঠিক্ বুঝিতে পারিলাম না, কিরূপে আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠের বা মুক্তের কর্ম্মাধিকার নাই বলিতেছেন। নিষ্কাম যাগাদিকর্ম্মাধিকার তাঁহাদের অপরিত্যাজ্য, ইহা শ্রীভগবান্ গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"যজ্ঞো দানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানিচ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥

নিবন্ধে ত্রিসপ্ততিতম পটলে যথা :—

"জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনো বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণম্।
তাবদ্বর্ণাশ্রমাচারঃ, কর্ত্তব্যঃ কর্ম্মমুক্তয়ে॥

যজ্ঞ দান ও তপস্যা এই ত্রিবিধ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে, কর্ত্তব্য, কারণ এই ত্রিবিধ কর্ম্ম মনীষিগণের অর্থাৎ ফলকামনাবিরহিত সাধকগণের পাবন অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি-হেতু। এই যজ্ঞ দান ও তপস্যা, হে পার্থ! আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য—ইহা আমার উত্তম ও নিশ্চিত মত। অর্থাৎ মুমুক্ষু জ্ঞানী বা অজ্ঞানীই হউক্ কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভের জন্য বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম যতক্ষণ দেহধারণ ততক্ষণ করিতে হইবে। সুতরাং গুরো, ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ম্মাধিকার যে নাই তাহা ত ঠিক্ বুঝিতেছি না?

গুরু। বৎস, তোমার এই আশঙ্কা ঠিক্ বটে, কিন্তু দেখিতেছ কি, কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভের জন্যই কর্ম্ম বিহিত; তাহাতে মুমুক্ষুর কর্ম্মাধিকার বলা হইয়াছে, মুক্তের নহে, মুমুক্ষু ও মুক্ত এক নহে। এতদুভয়ে অনেক প্রভেদ। কর্ম্মবন্ধন হইতে যে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত সেই মুক্তপুরুষ, যে ঐ বন্ধন

হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছে কিন্তু মুক্ত হয় নাই সেই মুমুক্ষু। এই মুমুক্ষুদিগের নিষ্কাম কর্ম্ম ইত্যাদি বিহিত, মুক্তের জন্য নহে, মুক্তের কর্ম্মাধিকার নাই। তাহা বেদান্তসারে বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"অধিকারী তু বিধিবদধীত-বেদ-বেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ-বর্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা। যথাবিধি বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া আপাতত অখিল বেদার্থে অবগত; এই জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য-নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জন-পূর্ব্বক নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা দ্বারা নিখিল-পাপ-বিহীন হওয়ায় নিতান্ত নির্ম্মলান্তঃকরণ এবং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন পুরুষই মোক্ষাধিকারী। এই হেতু "যদা সর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যাদি বচন দ্বারা কর্ম্মাধিকারী সাত্ত্বিক সাধকের স্তুতি মাত্র বুঝিতে হইবে। উহা যে যথাশাস্ত্র ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির পক্ষ নহে, তাহা এই মোক্ষাধিকারী হইতেই বুঝা যাইতেছে। ঐরূপ বিধিনিষেধ মুমুক্ষুর নিমিত্ত বিহিত, মুক্তের জন্য নহে, এই মুক্তপুরুষ কর্ম্মকাণ্ডে সম্পূর্ণ উদাসীন। বহির্মার্গাদি কর্ম্মে তাহার অধিকার নাই, তিনি ত্রিগুণাতীত আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী; তাঁহার উপাস্য ও উপাসনা নাই, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবান্ গুণাতীতের লক্ষণ বলিয়াছেন :—

"সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

যাঁহার দুঃখ ও সুখ সমান, যিনি সম প্রসন্ন, যাঁহার নিকট লোষ্ট্র কাঞ্চন সমান, প্রিয় ও অপ্রিয় যাঁহার তুল্য, যিনি ধীর ও যাঁহার নিন্দা ও প্রশংসা তুল্য, যাঁহার মান ও অপমানে সমান জ্ঞান, যিনি শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান করেন এবং যিনি সর্ব্বপ্রকার আরম্ভ অর্থাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন-তিনি গুণাতীত হইয়াছেন। ভগবান্ আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যে সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী দেহধারণমাত্রনিমিত্ত-ব্যতি-

রেকেণ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগীত্যাগীত্যর্থঃ ॥——দেহধারণমাত্র প্রয়োজনভিন্ন সর্ব্ববিধ কর্ম্মত্যাগী।

আরও নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ৪।৬ উক্ত আছে :—

"উৎপন্নাত্মাববোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ।
অযত্নতোভবন্ত্যস্য ন তু সাধনরূপিণঃ ॥

যাঁহার আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার দ্বেষশূন্যত্বাদিগুণ সমূহ বিনা যত্নে সমুৎপন্ন হয়, তাহারা তাঁহার সাধনস্বরূপ নহে।

সর্ব্ববেদবেদান্তসিদ্ধান্ত বেদান্তসারে উক্ত আছে—

কিং বহুনা দেহযাত্রামাত্রার্থমিচ্ছানিচ্ছাপরেচ্ছাপ্রাপিতানি সুখদুঃখ-লক্ষণান্যারব্ধফলান্যনুভবন্নন্তঃকরণাভাসাদীনামবভাসকঃ সংস্তদবসানে প্রত্যগানন্দপরব্রহ্মণি প্রাণে লীনে সত্যজ্ঞানতৎকার্য্যসংস্কারাণামপি বিনাশাৎ পরমকৈবল্যমানন্দৈকরসমখিলভেদপ্রতিভাসরহিতমখণ্ডং ব্রহ্মাবতিষ্ঠতে ॥ ৩৮ ॥ বিশেষ আর কি বলিব, দেহ-যাত্রামাত্র-নির্ব্বাহ-নিমিত্ত স্বেচ্ছাকৃত ভিক্ষাটনাদি, পরেচ্ছাকৃত অর্থাৎ সমাধিঅবস্থাতে শিষ্যাদিপ্রদত্ত অন্নাদি এবং অনিচ্ছাকৃত অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় বা ব্যুত্থানদশায় আকাশ হইতে পতনতুল্য অকস্মাৎজাতপাষাণ-পতন কণ্টকবেধাদি ত্রিবিধ প্রারব্ধমাত্র-জনিত সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া বুদ্ধিপ্রভৃতির সাক্ষিরূপে সর্ব্বপ্রকাশক হইয়া ভোগদ্বারা সেই প্রারব্ধ-কর্ম্মক্ষয় হইলে অভিন্নানন্দ পরব্রহ্মে প্রাণ লীন হয়, তাহাতে অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য সংস্কারাদির বিনাশবশতঃ পরমকৈবল্য, আনন্দৈকরস, অখিলভেদবুদ্ধিবিরহিত, অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হন।

আরও নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে প্রকারান্তরে কথিত হইয়াছে :—

অধর্ম্মাজ্জায়তেঽজ্ঞানং যথেষ্টাচরণং ততঃ।
ধর্ম্মকার্য্যে কথং তৎ স্যাদ্ যত্র ধর্ম্মো বিনশ্যতি ॥

অধর্ম্ম হইতে অজ্ঞান এবং তাহা হইতে যথেষ্টাচরণ। যেস্থানে অর্থাৎ মুক্তপুরুষে ধর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে (যাঁহার শ্রুতিস্মৃতিবিহিত ধর্ম্মকার্য্যের কর্ত্তব্যতা নাই) তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যে যথেষ্টাচরণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে—অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ কখন যথেষ্টাচার করিতে পারেন না।

মহাভারতেও ধর্ম্মত্যাগের উল্লেখ আছে :—

নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতম্।
অক্ষীণং ক্ষীণকর্ম্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

যাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করা যায় না, যাঁহার নমস্য নাই, যাঁহার কর্ম্মারম্ভ নাই, যিনি অস্তুত, যিনি অক্ষীণ এবং যাঁহার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসমূহ ক্ষীণ হইয়াছে, দেবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া থাকেন।

আরও বৃহদারণ্যকশ্রুতি বলিয়াছেন "অমৌনং মৌনং চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ।" ব্রহ্মকে মনন ভিন্ন কোনরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না, মনন দ্বারা অনুসন্ধান করা যায়, ইহা নিঃশেষরূপে জ্ঞাত হইলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মনিষ্ঠ কৃতকৃতার্থ হন।

যোগিনীতন্ত্রে ঃ—

সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং পশ্যেজ্জগদেতচ্চরাচরং।
আত্মদেহাধিকং কিঞ্চিজ্জানাতি নচ কর্হিচিৎ॥
তেনৈব ব্রহ্মজ্ঞানেন দেহকর্ম্মাদিকং খলু।
ভস্মীভূতং মহেশানি ঋষেস্তস্য মহাত্মনঃ॥

অনন্তর তিনি এই অখিল চরাচর ব্রহ্মময় অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি দেহাদি কিছুই কখনও জানিতে পারেন নাই। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা সেই মহাত্মা ঋষির দেহকর্ম্মাদি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গেল।

বশিষ্ঠ বলেন—"ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্‌যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ" যোগী কর্ম্ম ত্যাগ করেন না, কর্ম্ম তাঁহাকে ত্যাগ করে।

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ৪। ৬২—যো হি যত্র বিরক্তঃ স্যান্নাসৌ তস্মিন্ প্রবর্ত্ততে। লোকত্রয়াদ্বিরক্তত্বান্মুমুক্ষুঃ কিমিতীহতে॥—

যে যাহাতে বিরক্ত, সে তাহাতে কখনই প্রবৃত্ত হয় না। লোকত্রয়ে বিরক্ততানিবন্ধন মুমুক্ষু কি চেষ্টা করিবেন? বেদান্তসারে বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী বলেন—ঔদাসীন্যমেব মুক্তলক্ষণং ন বিধিপরতন্ত্রপ্রবৃত্তিমত্ত্বং ন বা নিষেধাতিক্রম ইতি॥—সর্ব্বকর্ম্মে ঔদাসীন্যই মুক্তলক্ষণ, কোন বিধি-প্রতিপালন-প্রবৃত্তি বা নিষেধের অতিক্রম তাঁহার দ্বারা হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবলরাম বিদ্যারত্ন সাংখ্যভূষণ।

আগমনী।

(১)

নিশাশিশীরকচ্ছবিপ্রকাশিতারহারকঃ
সিতাংশুভাতিবস্ত্রকো লসৎ সিতাব্জহস্তকঃ।
ঋতুর্হি শারদো ঘনস্বনৈর্ভগীরথো যথা
বিঘোষয়ত্যহো জনে জগৎপ্রসূসমাগমম্ ॥

(২)

ঘনাম্বুপাতনচ্ছলৈ মুদশ্রুভির্যুতাঙ্গকা
বিকাশিকাশসুন্দরপ্রধৌতশুভ্রবস্ত্রকা।
সরোজরাজিরাজিতা বিহঙ্গকূজনচ্ছলাৎ
প্রগায় মাতৃমঙ্গলং সমাহ্বয়েৎ শরৎ নু তাম্ ॥

(৩)

শিবাগমেঽখিলদ্রুমো গৃহীতপুষ্পশাখকঃ
হিমাশ্রুপাতনৈরহো নিষেচিতস্ববিগ্রহঃ।
সমর্চ্চয়েৎ প্রসূপদং, পতত্রিকূজনচ্ছলৈঃ
নিবেদয়েৎ মনোব্যথাঃ, তথাপি কিং জড়ঃ নহি ॥

(৪)

অনন্তমাতৃভক্তিতোদ্রবীকৃতাম্বুবিগ্রহা
জলাশয়া নিমীল্য কিং বিকাশিপদ্মনেত্রকম্।
হিমাশ্রুভির্বিরাজিতং নিলীনভৃঙ্গতারকং
প্রমত্তসারসস্বনৈঃ স্তুবন্তিতাং ত্রিতাপহাম্ ॥

(৫)

বিলোকয়েদহো নকিং ? জড়োঽপিতালবৃক্ষকঃ
শ্রমাপহর্ত্তৃমানসো গৃহীততালবৃন্তকঃ।
শিবঙ্করীসমাগমে সুবীজয়ত্যহর্নিশং।
মহীক্ষিতজ্জতা বুধ কদাপিজোঽহকাপতি।

(৬)

স্বভূমিদুঃখতো দ্রবস্বরূপিণী তরঙ্গিণী
কলধ্বনির্জ্জগজ্জনে নিবেদ্য দুঃখকাহিনীম্।
সুগায় মাতৃগীতকং ভবচ্ছিদং প্রমোদিতা
প্রয়াতি ভর্ত্তৃসঙ্গমে ভবৈকতারণে ন কিম্ ?

(৭)

ত্রিতাপদুঃখনাশিনি ! ত্রিলোচনে ! শিবাত্মিকে !
তবাঙ্গুলিপ্রহেলনাৎ প্রদীপয়ন্ জগজ্জনম্।
তমোহরঃ করং ন্যসেৎ সদাগতিঃ সুধাতি চ
সদৈবসংসুধাকরে ! তবৈব সা কৃপাচ্ছবিঃ ॥

(৮)

ইদংশিবে ! চরাচরং ত্বয়ৈব লব্ধজীবনং
ত্বয়িস্থিতং কিয়দ্দিনং পুনস্ত্বয়িপ্রলীয়তে।
তথাপি মোহতো জনৈরহংকৃতৌসদাস্থিতং
দয়াময়ি ! ক্ষমস্বতৎ তবৈব সন্ততিক্রটিম্ ॥

(৯)

সমেহিসর্ব্বমঙ্গলে, বিধেহিমঙ্গলং শিবে !
অনন্তদুঃখবারিধৌ নিমগ্নসুপ্তভারতম্।
বিলোকয়, প্রবোধ্যতাং প্রবোধরূপিণি ! স্বতঃ
তবৈবভারতং প্রিয়ং ত্বদাশ্রিতং সদাস্থিতম্ ॥

(১০)

ইদং জগজ্জগন্ময়ি ! প্রতিচ্ছবিস্তবৈবতু
জগৎপ্রপঞ্চরূপিকে ! জগৎপ্রপঞ্চকৈঃ কিমু ?
ততঃ কিমত্রপূজনে প্রদেয়মস্তিশারদে !
স্বভাবতোঽনুকম্পয়া যদি স্বয়ং বিতুষ্যসি ॥

(১১)

নীরূপেঽখিলরূপিকে ! গুণময়ি ! ত্রৈগুণ্যহীনাত্মিকে
দুর্গে ! দুর্গভবাব্ধিভঙ্গভয়কৃৎভ্রান্তোক্তিমাকর্ণয়।
আনন্দামৃতসেচনেন মৃতকং সঞ্জীব্যতাং ভারতং
ভূয়াচ্ছান্তিরবিচ্যুতা, তবপদে ভক্তিঃ পরাশাশ্বতী ॥

(১২)

ভোঃ শর্ব্বাণি ; তবাগমেন চ নিতানন্দেনমুগ্ধাবয়ং
কিংবাদ্যং কিমুদেয়মস্তিশুভদে। তন্নৈবজানীমহে।
কামাদিং বলিমদ্ভুতং রিপুচয়ং ভক্তিঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিং।
রক্তাক্তঞ্চ গৃহাণদেবি। তদিদংমাদিস্মর ত্বংসুতান্॥

(১৩)

জ্ঞানিবৃন্দচিত্তনিত্তরাজহংসরূপিকেহ
জ্ঞানদৈত্যখণ্ডকারি বোধখড়্গধারিকে।
পাপতাপশান্তিকারি-শান্তিবারিদায়িকে।
এহিদেবি। দেহি শর্ম্ম রক্ষ দক্ষপুত্রিকে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যস্মৃতিতীর্থচ্ছাত্রাণাং

নিবেদনমেতৎ।

গণপতির গণপতি-দর্শন।

"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" শাস্ত্র পড়িয়া বেদবেদান্ত আলোচনা দ্বারা তর্ক জিনিষটা বাড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভগবান্‌লাভ হয় না। ভগবান্ ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু—ভক্তাধীন—তিনি ভক্তির ডোরেই বাঁধা পড়েন। ভক্ত তাঁহাকে যেরূপেই দেখিতে চায়, তিনি সেইরূপেই তাহাকে দর্শন দেন। একথার জাজ্বল্যমান সাক্ষী গণপতি ভট্ট।

গণপতিভট্টের নিবাস কর্ণাটপ্রদেশে। গণপতি নামেও গণপতি, কাজেও "গণপতি" ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানেন না। দিনরাত গণপতির ধ্যান—গণপতির পূজা—গণপতির অর্চ্চনাতে গণপতির দিন অতিবাহিত হইত—গণপতিই গণপতির ব্রহ্ম। গণপতি শুনিলেন, নীলাচলে গেলে ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে। গণপতি উর্দ্ধশ্বাসে নীলাচলের দিকে ছুটিলেন। কঙ্করময় রাস্তায় পদযুগল ক্ষত বিক্ষত হইতেছে—কণ্টকের উপর কণ্টক বিঁধিয়া গণপতির দেহ হইতে শোণিতধারা প্রবাহিত হইতেছে—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে সমস্ত দেহ

ঘর্ম্মাক্ত হইয়েছে, গণপতির সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, তিনি প্রাণপণে ছুটি-তেছেন নীলাচলে ব্রহ্মদর্শনে। অবিশ্রান্ত পথহাঁটার পর প্রায় মাসাধিককাল পরে গণপতি প্রায় নীলাচলের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। পথক্লান্তিতে পথিপার্শ্বস্থ একটা ন্যগ্রোধ-দ্রুমতলে বসিয়া আছেন, এমনসময়ে দেখেন, কাতারে কাতারে বহুযাত্রী নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। গণপতি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন "ওগো তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?" পথিকেরা উত্তর করিল "আমরা নীলাচলে ব্রহ্মদর্শনে গিয়াছিলাম।"

গণপতি তাহা শুনিয়া ভাবিলেন,—এরা যদি নীলাচলে ব্রহ্মদর্শনেই গিয়া থাকে, তবে ফিরিয়া আসিল কিরূপে? ব্রহ্মদর্শন করিয়া কেহ ত ফিরিয়া আসেনা! ব্রহ্মকে দর্শন করিলে সে যে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়—আর তাহাকে এই আধিব্যাধি-জরা-মরণ-প্রপীড়িত সংসারের কুটিলচক্রে পড়িয়া চূর্ণীকৃত হইতে হয় না! তবে এরা মিথ্যাবাদী, নিশ্চয়ই এরা মিথ্যা কথা বলিতেছে। এই ভাবিয়া গণপতি নীলাচলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই আর একদল তীর্থযাত্রীর সহিত গণপতির সাক্ষাৎ হইল। গণপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওগো তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?" তাহারাও বলিল "নীলাচলে।"

তখন গণপতি বসিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, "তবে কেন মিছা পথশ্রমে ক্লান্ত হই। নীলাচলে সত্যই তবে ব্রহ্ম নাই। যদি থাকিতেন তবে ইহারা কেন মুক্ত না হইয়া ফিরিয়া আসিবে। যাই, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই।"

এই ভাবিয়া গণপতি স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে নীলা-চলে বসিয়া যিনি সর্ব্বান্তর্যামী—তিনি সমস্তই জানিতে পারিলেন। ভক্ত-বৎসল জগন্নাথ অমনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে গণপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ওগো ম'শায়, তুমি কোথায় যাইতেছিলে, আর ফিরিয়াই বা চলেছ কেন?"

গণপতি একটু বিরক্তস্বরে বলিলেন, "শুনবে কি ম'শায়, যাচ্ছিলেম নীলা-চলে জগন্নাথদর্শনে, আমি জানতেম জগন্নাথ স্বয়ং ব্রহ্ম, তাঁকে দেখলে জীবের আর সংসারের তাপে দগ্ধ হইতে হয় না—সে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধ, মুক্ত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হয়। কিন্তু শুনবে কি ম'শায়, পথে যেতে যেতে আমার সহিত অনেক যাত্রীর দেখা হইল, তাহারা সকলেই বলিল যে, "নীলাচল হইতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া আসিতেছি," তাহা শুনিয়া আমি ভাবিলাম,

। হ'লে নীলাচলে ব্রহ্ম নাই—ব্রহ্ম নাই—যদি থাক্‌তেন, তবে নিশ্চয়ই এরা মুক্ত না হ'য়ে ফিরে আস্‌ত না।"

ব্রাহ্মণবেশী জগন্নাথ গণপতির কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওগো মশায়, তুমি ভুল বুঝেছ। নীলাচলে ব্রহ্ম আছেন। তুমি সেখানে গেলে তাঁর দর্শন পাবে। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পদ্রুম। তাঁর নিকট ভক্ত যে বাঞ্ছা প্রকাশ করে, তিনি তাহার সেই আশা পূর্ণ করেন। যে তাঁর নিকট মুমুক্ষু হইয়া যায় সে মুক্ত হয়—যে তাঁর নিকট ধন চায় তিনি তাহাকে ধন দেন—যে বিদ্যা চায় তাহাকে তিনি বিদ্যা দেন—তিনি যে বাঞ্ছাকল্পতরু। তুমি মুমুক্ষু হ'য়ে তাঁর নিকট যাও, তুমি মুক্তি পাবে।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া গণপতির মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ফিরিয়া নীলাচলের দিকে প্রধাবিত হইলেন। গণপতি যেদিন জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, সেদিন ভাগ্যক্রমে জগন্নাথের স্নানযাত্রা। শত শত—সহস্র সহস্র যাত্রী জগন্নাথের রথরজ্জু আকর্ষণ করিতেছে—রথের উপর জগন্নাথ বলরাম, সুভদ্রা আসীন। সে দৃশ্য বড় সুন্দর! বড় মনোরম! গণপতি সেই চিরবাঞ্ছিত জগন্নাথের বিগ্রহের নিকট দাঁড়াইলেন, পাণ্ডাগণের নিষেধ সত্বেও জগন্নাথের হাতে মুখে হাত বুলাইলেন—কিন্তু কি দেখিলেন? দেখিলেন, এ মূর্ত্তি ত তাঁহার আরাধ্যদেবতা গণপতি নহে! এ দেবতার ত গণপতির মত শুণ্ড নাই—পেটটীও তাঁহার মত নহে—এ দেবতার সেরূপ দু'টী দাঁতও ত নাই। অতএব দেবতা কিছুতেই ব্রহ্ম নহে। এই ভাবিয়া গণপতি বড় বিরক্তভাবে নীলাচল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে অন্তর্য্যামী জগন্নাথ সমস্তই জানিতে পারিলেন। ভক্তের অবিমিশ্র ভক্তি দেখিয়া ভগবান্ মনে মনে বড় আনন্দ পাইলেন। ভক্ত মনে ব্যথা পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য দেখিয়া ভগবান্ কি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি আবার সেই ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া গণপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "ওহে মহাশয়! তুমি ওরূপ ক্রোধান্ধ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছ কেন?"

গণপতি ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া বলিলেন—"যাও ঠাকুর যাও, তুমি ব্রহ্ম দেখাবে ব'লে মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে শেষে এক কাঠের পুতুল দেখালে। ঐ কি আমার ব্রহ্ম? আমার ব্রহ্মের যে মুখে শুণ্ড, দু'টী বড় বড় দাঁত, আর পেটটি তাঁর মস্ত বড়।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ওগো মহাশয়, এবার চল, এবার তুমি নিশ্চয়ই তোমার ব্রহ্মকে দেখতে পাবে। আমি বলছি পাবে।"

গণপতি ব্রাহ্মণের কথায় ফিরিয়া গেলেন। যাইয়া দেখেন, সত্য সত্যই জগন্নাথ গণপতির আকারে রথের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। গণপতি তদ্দর্শনে একেবারে ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। ভক্তিগদগদকণ্ঠে করযোড়ে বলিলেন "ওহে ঠাকুর, যদি দেখা দিয়াছ ত বল যে, প্রতিবৎসর এমনইভাবে স্নানযাত্রার দিন এই বেশেতেই দেখা দিয়ে আমার মান বজায় রাখিবে।"

জগন্নাথ ঘাঁড় নাড়িয়া সম্মতি দিলেন। তখন ভাববিহ্বল গণপতি গলদশ্রু-লোচনে সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন—একদৃষ্টে সেই বিগ্রহের দিকে তাকাইয়া রহিলেন—তাঁহার দেহ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির্গত হইয়া তীরবেগে তাহা জগন্নাথের দেহে প্রবেশ করিল—গণপতির সংজ্ঞাহীন দেহ কেবল পড়িয়া গেল। ভক্তবীর গণপতি গণপতির দেহে বিলীন হইলেন।

কত দিন হইল গণপতি পুরুষোত্তমে গণপতি দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু আজিও জগন্নাথদেব স্নানযাত্রার দিনে গণেশবেশে ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হন।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১

সান্বয়ব্যাখ্যা। [হে পরন্তপ (শত্রুতাপন অর্জ্জুন) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণক্ষত্র বৈশ্যানাং) শূদ্রাণাংচ স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ (স্বভাবঃ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিঃ যদ্বা পূর্ব্বজন্মসংস্কারঃ তৎপ্রভবৈঃ তস্মাৎ প্রাদুর্ভূতৈঃ গুণৈঃ সত্বাদিভেদৈঃ) কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি (প্রকর্ষেণ বিভক্তানি) ৪১

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন, প্রকৃতিজাত সত্বাদি-গুণানুসারেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল পৃথক পৃথক রূপে বিভক্ত হইয়াছে। ৪১

আলোচনা। ভগবান্ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকে বলিয়াছেন—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥

প্রকৃতিজাত সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ দেহে থাকিয়া দেহীকে দেহে বন্ধন করে—অর্থাৎ পুরুষকে সংসারে আবদ্ধ করিবার হেতুই সত্ত্বাদি তিন গুণ। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকে বলিয়াছেন—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥

অর্থাৎ দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া দেহী জন্ম-মৃত্যু-জরাজনিত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। গুণত্রয় অতিক্রম করিতে না পারিলে দেহী অর্থাৎ জীব অন্যপ্রকারে মুক্ত হইতে পারে না, অথচ সংসারের প্রাণিসমূহ এবং তাহাদের ক্রিয়া কর্ম্ম জ্ঞান বুদ্ধিধৃতি শ্রদ্ধা দান আহার সকলই ত্রিগুণাত্মক বলিলেন। যদি ত্রিগুণ ছাড়া কিছুই না, হয় তবে জীবের মুক্তি কি উপায়ে হইতে পারে? ভগবান্ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ২২।২৩।২৪শ শ্লোকে গুণাতীতের লক্ষণ বলিয়াছেন এবং ২১শ শ্লোকে অর্জ্জুনের তৃতীয় প্রশ্নের—"কথং চৈতাং স্ত্রীন্ গুণনতিবর্ত্ততে" অর্থাৎ কি উপায়ে গুণাতীত হওয়া যায়, ইহার উত্তরে ২৬শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিযোগে আমার সেবা করেন, তিনি গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হইতে পারেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্লোকে এই ত্রিগুণাত্মক সংসারকে ক্ষণবিধ্বংসি অশ্বত্থবৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া, বিষয়-বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া, মোক্ষপথের অন্বেষণ করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। ষোড়শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুগত থাকিয়া যথাবিধান কার্য্য করাই সত্ত্বশুদ্ধি সম্যক্ জ্ঞান মুক্তিমূল বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে ভগবান্ এতাবৎ বাক্যের সামঞ্জস্য করিয়া বেদশাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অত্যাবশ্যকতা দেখাইতেছেন।

ইহাদ্বারা বুঝা যাইবে যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণ প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণানুসারে শাস্ত্রোক্ত বিধানে স্ব স্ব বর্ণোচিত কার্য্য করিলে ভগবানের প্রীতিউৎপাদন করিতে সমর্থ হন। ভগবানের প্রসন্নতা লাভ হইলে পুরুষ বিবেকবৈরাগ্যরূপ অসঙ্গ শস্ত্রের এবং ভগবানের প্রতি অব্যভিচারী ভক্তিলাভের অধিকারী হইতে পারেন। ইহাই জীবের মুক্তির সোপান।

এজন্য ভগবান্ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণের বর্ণাশ্রমোচিত গুণ ও কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এখানে এরূপও প্রশ্ন হইতে পারে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা এক ঈশ্বর সকলকে একপ্রকার সৃষ্টি না করিয়া কেন ভিন্ন ভিন্নরূপ করিলেন এবং তাহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের বিধানই বা কেন? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন "স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ" অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি অথবা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারই ইহজন্মের স্বভাব হয়। সেই স্বভাব-প্রভাব হইতে জাত যে গুণ, তাহাই বিভিন্নরূপের কারণ; উহাতে পরমেশ্বরের কোন পক্ষপাতিতা নাই। অনাদিকালসিদ্ধসংস্কারবশতই এইরূপ হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি-গুণভেদে এইপ্রকার বর্ণভেদ এবং বর্ণভেদে কর্ম্মাধিকার বেদে কথিত হইয়াছে। ভগবান্ চতুর্থ অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকেও বলিয়াছেন "চাতুর্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"—এই গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চতুর্বর্ণের মধ্যেও শাস্ত্রে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। অত্রি সংহিতার ১৬৪ শ্লোকে গুণকর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণকেই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—

> দেবো মুনির্দ্বিজোরাজা বৈশ্যঃ শূদ্রোনিষাদকঃ।
> পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥ অত্র ৩৬

স্ব স্ব গুণক্রিয়া অনুসারে ব্রাহ্মণগণ দেব মুনি দ্বিজ রাজা বৈশ্য শূদ্র নিষাদ পশু ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল এই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত। অত্রি-সংহিতায় ১৬৪ হইতে ১৭৪ শ্লোকে এই দশ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলা হইয়াছে। এস্থলে তৎসমুদয় উদ্ধৃত করা অপ্রয়োজন। এই ধর্ম্মচ্যুতি হইতেই বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি। তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম শাস্ত্রে পৃথক পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে। যখন কর্ম্মভূমি এই ভারতবর্ষে বৈদিকধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, যখন রাজগণ বৈদিকধর্ম্মকেই ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের মূল বলিয়া জানিতেন, তখন গুণকর্ম্মের তারতম্য অনুসারে বর্ণবিভাগ হইত। এখনও বর্ণ-ধর্ম্মচ্যুতি নিত্যই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সে বৈদিক শাসন নাই, সুতরাং এখন আর সে বর্ণ-বিচার নাই। বর্ণবিচার সামাজিকভাবে হিতকর কিনা, তাহার মীমাংসা অতি জটিল, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে যে আবশ্যক, তাহার আর সন্দেহ নাই। গুণকর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে যে আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি অবনতি হয়, দাসীপুত্র নারদের দেবর্ষিত্ব এবং ভরত ঋষির পশুযোনি-প্রাপ্তি তাহার চরম দৃষ্টান্ত। ৪১

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং ॥ ৪২

সান্বয়ব্যাখ্যা। শমঃ (চিত্তসংযমঃ) দমঃ (ইন্দ্রিয় সংযমঃ) তপঃ। (সপ্তদশাধ্যায়োক্তং শরীরং বাচিকং মানসং) শৌচং (বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধিঃ) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জবং (সারল্যং) জ্ঞানং (বেদশাস্ত্রাণাং পদব্যাখ্যার্থ-জ্ঞানং) বিজ্ঞানং (শাস্ত্রাদিতত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ) আস্তিক্যং (কর্ম্মণি তৎ ফলে শ্রদ্ধা, অস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ) এতৎ স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম্ম (ব্রাহ্মণস্য স্বভাবজাতং কর্ম্ম) ৪২

বঙ্গানুবাদ। মনঃ সংযম, বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রার্থবোধ, শাস্ত্রতত্ত্ব নিশ্চয়, কর্ম্মফল ও পরলোকে বিশ্বাস এই নয়টী ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। ৪২

আলোচনা। সত্ত্বগুণের লক্ষণ ভগবান চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ ৯ম ১১।১৪ ১৬।১৭।১৮শ শ্লোকে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে ২০শ হইতে কতিপয় শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ সহজতঃ সত্ত্বগুণবহুল প্রশান্ত। ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক নয়টী গুণের উল্লেখ হইল। শমঃ—অর্থাৎ অন্তঃকরণের বাহ্যবৃত্তি-সংযমন, দম—চক্ষুকর্ণ দিকে বাহ্যবিষয়-ভোগ হইতে নিয়মিতরূপে দমন, তপঃ—সপ্তদশাধ্যায়োক্ত শারীরিক বাচিক ও মানসিক তপস্যা, শৌচ—বিবেকদ্বারা মন শুদ্ধি এবং পবিত্র মৃৎজলাদি দ্বারা শরীরশুদ্ধি, ক্ষান্তিঃ—যে বৃত্তির দ্বারা মনুষ্য লাঞ্ছিত হইয়াও সাধ্যমত ক্রোধোপশম করিতে পারে তাহাই ক্ষান্তি; আর্জব—সরলতা, জ্ঞান—শাস্ত্রার্থ—বোধ, বিজ্ঞান—শাস্ত্রতত্ত্বের মর্ম্মার্থবোধ, আস্তিক্য—কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবিশ্বাস। সত্ত্বগুণাত্মক এই নয়টী গুণ ব্রাহ্মণের। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণেরও এই সকল গুণ থাকিতে পারে না এমন নয়। তবে এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজ এবং বিশেষ ধর্ম্ম; অন্যবর্ণেরও কল্যাণকর জন্মান্তরে কুশলের হেতু। ৪২

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দ্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজং ॥ ৪৩

সান্বয়ব্যাখ্যা। শৌর্য্যং (শূরস্যভাবঃ পরাক্রমঃ) তেজঃ (প্রাগল্ভ্যং) ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং ধারণম্) দাক্ষ্যং (নৈপুণ্যং কৌশলং) যুদ্ধে চ আপি অপলায়নং (যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা) দানং (ঔদার্য্যং যোগ্যপাত্রেষু মুক্তহস্ততা) ঈশ্বরভাবঃ (প্রভুশক্তিপ্রকটীকরণং নিয়মনশক্তিঃ) ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজং (এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম)। ৪৩

বঙ্গানুবাদ। শূরত্ব, তেজঃ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, প্রভুত্ব এই কয়েকটী ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্ম।

আলোচনা। ক্ষত্রিয় মিশ্রিতসত্ত্বরজোগুণবিশিষ্ট। ক্ষত্রিয়ের যে কয়েকটী কর্ম্ম উক্ত হইল, ইহাও সত্ত্ব ও রজোগুণাত্মক। শৌর্য্য—বলবান্ শত্রুকে দমন করিবার পরাক্রম। তেজ—অন্য কর্ত্তৃক পরাভূত না হইবার শক্তি। ধৃতি—ধৈর্য্য বিপদে পড়িয়াও অবিচলিত থাকা। দাক্ষ্য—কার্য্যকুশলতা। যুদ্ধে অপলায়ন—পুনঃ পুনঃ শত্রুকর্ত্তৃক আহত হইয়াও পরাঙ্মুখ না হওয়া। দান—যোগ্য পাত্রে আত্মস্বত্বত্যাগপূর্ব্বক গো সুবর্ণ ভূম্যাদি অর্পণ। ঈশ্বরভাব—অধীন বর্ণ বা দুর্জ্জনের দমন জন্য প্রভুভাব নিয়মনশক্তি। এই সকল সত্ত্বরজোগুণোচিত কার্য্য ক্ষত্রিয়ের। এইসকল বর্ণোচিত কর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্ম-পালন-জন্য পুণ্যাধিকারী হইতে পারেন। ৪৩

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

প্রতীক্ষায়।

জলভরা তারা দু'টী বুকভরা ব্যাথা নিয়ে
কেগো তুমি উন্মাদিনী আছ দ্বারে দাঁড়াইয়ে?
কেন গো কোমলকরে মথিয়া মাখন নানা
কেবল দুয়ার ঘর করিতেছ আনা-গোনা?
আঁখিজলে ধরা ভাসে অরুন্তুদ কি বেদনা!
তবুও যে গেছে চলে সে ফিরে আর এল না।
কেন শিখিপাখা ধরি আদর করিছ তুমি?
কাকপক্ষে কেন বক্ষে সোহাগে ধরিছ চুমি'?
কেন কাঁদ নন্দরাণী আছ কা'র প্রতীক্ষায়?
সে যে সুখে রাজপাটে আছে বসে মথুরায়॥

শুভ্রাংশু-গুম্ফিত কেশপাশে করি করার্পণ,
বামকরে ক্ষম্ভ গণ্ড বহে শ্বাস ঘনেঘন।

স্নেহের নির্ঝর যদি ভাঙিয়া পড়িয়া গেছে
বিরহ অশনি-পাতে, যে টুকু বা বাঁকি আছে,
করেছে আবৃত তারে তীব্রভাবে অভিমান ;
"আমি তার পিতা বটে সে ত আমার সন্তান।"
সন্তানের অদর্শনে অভিমান দূরে যায়
সম্মোহ আবেশে জ্ঞানী ভূপতিত নন্দ রায়।
মোহ আবরণে মুগ্ধ আছ তুমি প্রতীক্ষায়,
কিন্তু সে যে রাজা হ'য়ে আছে সুখে মথুরায়॥

কে তুমি চোখের জলে ভিজায়ে কদমতলা
আলুথালু কেশরাশি পাগলিনী প্রায় বালা ?
বসন্তসখারে কেন গঞ্জিতেছে বিধুমুখী,
সেও কাল বটে, কিন্তু তব দুঃখে মহাদুঃখী।
ধূলায় ফেলেছ দূরে চুয়া কুঙ্কুম চন্দন ;
কিন্তু কি আসিবে তাতে ফিরে শ্রীনন্দনন্দন ?
ত্যজিয়াছ আভরণ শ্রীহীন হয়েছে বেশ ;
দয়ানিধি নাম তার দয়ার নাহিক লেশ !
কদমের তলে বালা আছ মিছে প্রতীক্ষায়
সে যে সুখে রাজপাটে আছে বসে মথুরায়॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিরন্তর শব্দরাশি লইয়া নাড়াচাড়া করা বৃথা, ধর্ম্মের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে, নচেৎ ভাব হারাইয়া শব্দরূপ মহাবনে আত্মহারা হইতে হইবে। বিচার অপেক্ষা আচার শ্রেষ্ঠ। কুতার্কিক নিজের পথ হারাইয়া কান্তারে বিচরণ করিতে থাকে। পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, কৌলীন্য, ধনবত্তা কিছুতেই ধর্ম্ম মিলে না, চাই কেবল ভাবপ্রবণ

হৃদয়। হৃদয়ের বস্তু হৃদয়েই ধরিতে হইবে। সুতরাং হৃদয়খানা পবিত্র করা আবশ্যক, নচেৎ ভগবদ্দর্শন অসম্ভব। শৈবালদলে আচ্ছন্ন কমলিনী সৌরকরলাভে বঞ্চিত থাকে।

ধর্ম্ম, সর্বোচ্চ জ্ঞানস্বরূপ—তাহা ধন-বিনিময়ে কিনিবার জিনিষ নহে। গ্রন্থ হইতেও উহা পাওয়া যায় না। জগতের সর্ব্বত্র ঢুঁড়িয়া আসিতে পার, হিমালয়, আল্‌প্‌স্‌, ককেসস্‌ প্রভৃতি খুঁড়িয়া ফেলিতে পার, সমুদ্রের অতলতল আলোড়ন করিতে পার, তিব্বতের চারি কোণে অথবা গবি-মরুভূমে, চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পার, কোথাও উহা পাইবে না—যতদিন না তোমার হৃদয় উহা ধারণা করিতে সমর্থ হইতেছে, ও যতদিন না তুমি গুরু লাভ করিতেছ। বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট এই গুরুলাভ যখনই হইবে, অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতায় তাঁহার নিকট হৃদয় খুলিয়া দিবে। তিনিই যথার্থ পথপ্রদর্শক, আর সবাই বাক্যের যন্ত্র মাত্র। সাধারণ গুরুশ্রেণী হইতে উচ্চতর আর একশ্রেণীর গুরু আছেন, ঈশ্বরের অবতারগণ। ইঁহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি কেবলমাত্র ইচ্ছাদ্বারা অপরের ভিতর ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছায় অতিদুরাচার ও মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিণত হয়। ইঁহারা সকল গুরুর গুরু, মানুষের ভিতর ঈশ্বরের অভিব্যক্তি।

আমরা তাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্যতীত ভগবান্‌কে দেখিতে পাই না। আমরা তাঁহাদিগের উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না। ঐ সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের ঈশ্বর দেখিবার আর উপায় নাই। যদি আমরা আর কোনরূপে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা কিম্ভূত কিমাকার জীবগঠন করিয়া ফেলি, ও উহাকেই প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। একটা প্রচলিত কথা আছে যে, কোন আনাড়ী শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছিল। সেইরূপ, যখনই আমরা ভগবান্‌কে নির্গুণ পূর্ণস্বরূপ ভাবিতে যাই, তখনই অকৃতকার্য্য হইয়া থাকি। কারণ যতদিন আমরা মানুষ, ততদিন তাঁহাকে মনুষ্যপ্রকৃতি হইতে উচ্চতর কখনই ভাবিতে পারিব না। অবশ্য এমন সময় আসিবে, যখন আমরা মনুষ্য-প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া তাঁহার স্বরূপাববোধে সমর্থ হইব। কিন্তু যতদিন মনুষ্য থাকিব, ততদিন মানুষের ভিতর ও মানুষরূপেই তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। যাই বল না কেন, যত চেষ্টাই কর না কেন, ভগ-বান্‌কে মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পার না। ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগতের সকল

বস্তুর সম্বন্ধে খুব যুক্তিতর্কসমন্বিত বক্তৃতা দিতে পার, খুব যুক্তিবাদী হইতে পার, আর ভগবানের এসকল মনুষ্যাবতারের কথা সব ভ্রমাত্মক, ইহা এমনভাবে প্রমাণ করিতে পার, যাহাতে তোমার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয়, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে কি বলে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? এইরূপ অদ্ভুত বিচারবুদ্ধি দ্বারা কি লব্ধ হয়? শূন্য—কতকগুলি বাক্যাড়ম্বর মাত্র। সে সকল শব্দদ্বারা ভাববিশেষের উদয় হয় না। মাত্র শব্দাড়ম্বরকারী ও সামান্য ইতর ব্যক্তিতে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই। তবে সে লোকটা শান্তপ্রকৃতি, জগতের শান্তিভঙ্গ করে না, আর বৃথাবাক্যব্যয়কারী ব্যক্তি জগতে অশান্তি ও দুঃখ আনয়ন করে। প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত ধর্ম্ম কথায় কথা মাত্র। সুতরাং বৃথাবাক্যব্যয় ও প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যে প্রভেদ দেখা আবশ্যক। আত্মার গভীরতর প্রদেশে আমরা যাহা অনুভব করি, তাহাকেই প্রত্যক্ষানুভূতি বলে। এ বিষয়ে সহজজ্ঞান যত দুর্লভ আর কিছুই তত নহে। স্ব স্ব সীমা অতিক্রম করিয়া কেহই ভগবানের কল্পনা করিতে পারে না। যদি কেহ বলে যে, "আমাদিগের গণ্ডীর বাহিরে কিছু কল্পনা করিতে পারি," তবে সে প্রলাপভাষী বিকৃতমস্তিষ্ক।

ভগবান্ মানবের দুর্ব্বলতা বুঝেন, আর মনুষ্যজাতির হিতের জন্য অবতীর্ণ হন, কিন্তু মূর্খেরা তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করে। যখন বন্যা আসে, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খাল কিনারা পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া যায়। সেইরূপ যখন অবতার আসেন, তখন জগতের ভিতর মহান্ আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে। সেখানকার হাওয়াতেই যেন ধর্ম্মভাব খেলিতে থাকে। কেবলমাত্র ঈশ্বরের উপাসনার নামই ভক্তি। দেব, পিতৃ বা অন্য কোন উপাসনা ভক্তি-পদবাচ্য নহে। ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কর্ম্ম-কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, উহা উপাসককে কেবল কোনপ্রকার স্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফলপ্রদান করে। উহাতে ভক্তির উদয় হয় না, কোনপ্রকার মুক্তিও প্রসব করে না। ভক্তি, ধর্ম্মপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলিকে ঘৃণা করিতে নিষেধ করে। প্রতিনিয়ত ভাবপরিবর্ত্তন দ্বারা কৌতুহলনিবৃত্তি ধর্ম্ম নহে। আফিমের নেশার মত একটা প্রবল ঝোঁকও ধর্ম্ম নহে।

ভক্তিপিপাসু বিশ্বাসী সাধক, সাধনার অগাধজলে ডুবিয়া যায়, আর অন্যদিকে চায় না। বিবেক, ইন্দ্রিয়জয়, অভ্যাস, যজ্ঞ, শৌচ, বল ও অনুদ্ধর্ষ হইতে ভক্তিলাভ হয়। রামানুজের মতে খাদ্যাখাদ্য-বিচার। তাঁহার মতে

খাদ্যদ্রব্যের অশুদ্ধির কারণ তিনটী (১) জাতিদোষ অর্থাৎ খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ যথা, রশুন পেঁয়াজ প্রভৃতি স্বভাবতই অশুচি। (২) আশ্রয়দোষ, অর্থাৎ পতিত ও অভিশপ্ত ব্যক্তির হস্তে খাইলে যে দোষ। (৩) নিমিত্তদোষ, অন্য কোনও অশুচি বস্তুর, যথা, কেশ, ধূলি আদির সংস্পর্শজনিত দোষ। শ্রুতি বলেন,—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭ম প্র ২১ খণ্ড) শুদ্ধ আহার করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভগবানকে সর্ব্বদা স্মরণ করা যায়। খাদ্যাখাদ্য-বিচার ভক্তিমার্গাবলম্বী-গণের মতে চিরকালই একটী গুরুতর বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেক ভক্তসম্প্রদায় এ বিষয়টীকে অনেক অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন, বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা গুরুতর সত্য নিহিত আছে।

আমাদের মনে রাখা উচিত, সাংখ্যদর্শনের মতে সত্ত্ব, রজ, তমঃ, যাহাদের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি ও যাহারা বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জগৎরূপে পরিণত হয়। ঐ উপাদানেই সমুদয় নরদেহ নির্ম্মিত। উহাদের মধ্যে সত্ত্বপদার্থ অত্যাবশ্যকীয়। উহা হইতেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। আমরা আহারদ্বারা শরীরের ভিতর যে উপাদান গ্রহণ করি, তাহাতে আমাদের মানসিক গঠনের অনেক সাহায্য হয়, অতএব খাদ্যাখাদ্যবিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাস্তবিক খাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ-বিচার গৌণমাত্র। কিন্তু আজকাল আমাদের অনেক সম্প্রদায়ে এই আহারাদি বিষয়ের এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে, যেন তাঁহারা ধর্ম্মকে রান্নাঘরে পুরিয়া-ছেন। কখনও যে সেই ধর্ম্মের মহান্ সত্যসমূহ তথা হইতে বাহিরে আসিয়া আধ্যাত্মিকতার সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইবে, তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। এইরূপ ধর্ম্ম এক বিশেষ প্রকারের জড়বাদ মাত্র। উহা জ্ঞান নহে, ভক্তি নহে, কর্ম্মও নহে; উহা একপ্রকার পাগলামি মাত্র। যাহারা এই খাদ্যাখাদ্যবিচারকেই জীবনের সারকার্য্য স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি না হইয়া বাতুলালয়ে গতিই অধিক সম্ভব। সুতরাং ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে যে, খাদ্যাখাদ্যবিচার মনের স্থিরতারূপ উচ্চাবস্থালাভের জন্য বিশেষ আবশ্যক, নতুবা সহজে এই স্থিরতা লাভ করা যায় না। তারপর ইন্দ্রিয় সংযম। ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়াভিমুখী গতি নিবারণ ও উহা-দিগকে সংযত করিয়া নিজ ইচ্ছার অধীনে আনয়ন সকলধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। তারপর আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের অভ্যাস পরমাত্মাকে। আমরা আত্মার

ভিতর কত বিচিত্ররূপে অনুভব ও কত গভীরভাবে সম্ভোগ করিতে পারি তার কি ইয়ত্তা আছে? কিন্তু সাধকের প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রবল অভ্যাস ব্যতীত কখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে না। মন যেন সর্ব্বদাই সেই ঈশ্বরের চিন্তায় নিযুক্ত থাকে। প্রথম প্রথম ইহা বড় কঠিন বোধ হয়। কিন্তু অধ্যবসায়সহকারে চেষ্টা করিতে করিতে এই চিন্তার শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। পবিত্রতারূপ একমাত্র ভিত্তির উপর ভক্তিপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। বাহ্যশৌচ বা খাদ্যাখাদ্য, বিচার এই উভয়ই চাই. কিন্তু অন্তঃকরণ-শুদ্ধি ব্যতীত উহাদের কোনই মূল্য নাই। রামানুজ, অন্তঃশুদ্ধির উপায়-স্বরূপ নিম্ন লিখিত গুণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সত্য, আর্জ্জব, বা সরলতা, দয়া, নিঃস্বার্থ পরোপকার, অহিংসা-কায়মনোবাক্যে পরের হিংসা না করা, অভিধ্যা-পরদ্রব্যে লোভ, বৃথা চিন্তা ও পরকৃত অনিষ্টের ক্রমাগত চিন্তা পরিত্যাগ। এই তালিকার মধ্যে অহিংসাগুণটীর সম্বন্ধে দুইচারিটী কথা বলা আবশ্যক। সকল প্রাণী সম্বন্ধেই এই অহিংসা ভাব অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কেহ যেমন মনে করেন, মনুষ্যজাতির প্রতি অহিংসাভাব পোষণ করিলেই যথেষ্ট, অন্যান্য প্রাণিগণকে হিংসা করিলে ক্ষতি নাই। আবার কেহ যেমন কুকুর বিড়ালকে লালনপালন করেন, বা পিপীলিকাকে চিনি খাওয়ান, কিন্তু নিজ ভ্রাতার গলা কাটিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। বাস্তবিক অহিংসা তাহা নহে, যদি দেখা যায় কোন লোকের ভিতর ঈর্ষার ভাব আদৌ নাই, তবেই বুঝিতে হইবে তাহার ভিতর অহিংসাভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি, সাময়িক উত্তেজনায়, অথবা কোনরূপ কুসংস্কার বা পুরোহিতকুলের প্রেরণায় কোন সৎকর্ম্ম করিতে বা কোনরূপ দান করিতে পারে, কিন্তু তিনিই যথার্থ লোকপ্রেমিক যিনি কাহারও প্রতি ঈর্ষান্বিত নন্। সচরাচর জগতে যাঁহাদিগকে বড়লোক বলিয়া থাকে, তাঁহার নাম, যশ, বা সামান্য একটুকুরা স্বর্ণখণ্ডের জন্য পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া থাকেন। গোজাতি নিরামিষভোজী, মেষও তাহাই, তবে কি তাহারা পরম যোগী, পরম অহিংসক? যে কোন মূর্খ ইচ্ছামত খাদ্য বর্জ্জন করিতে পারে। উদ্ভিদ্‌ভোজী জন্তুগণ কেবল উদ্ভিদভোজন জন্য উন্নত পদবীতে আরূঢ় নহে, ইহারাও তদ্রূপ কোন খাদ্য বিশেষ ত্যাগগুণে জ্ঞানী হইয়া যায় না।

যে ব্যক্তি নির্দ্দয়ভাবে বিধবা, বালকবালিকাদিগকে ঠকাইয়া লইতে পারে, অর্থের জন্য যে কোন অন্যায় কার্য্য করিতে যাহার দ্বিধা নাই, সে ব্যক্তি

কেবল তৃণ ভোজন করিয়াও জীবন যাপন করে, তথাপি সে, পশু হইতে অধম। যাঁহার হৃদয়ে অপরের অনিষ্টচিন্তা পর্য্যন্ত উদয় হয় না, যিনি শুধু বন্ধুর নহে, পরম শত্রুর সৌভাগ্যেও আনন্দিত, সারাজীবন শূকরমাংস খাইলেও তিনি ভক্ত, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সকলের গুরু। সুতরাং একটাই সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বাহ্য ক্রিয়াকলাপ, অন্তশুদ্ধির সহায়ক মাত্র। সেই লোককে ধিক্, সেই জাতিকে ধিক্, যে লোক, যে জাতি, ধর্ম্মের সার ভুলিয়া অভ্যাস বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি মরণকামড়ে ধরিয়া থাকে। যদি ঐ অনুষ্ঠানগুলি আধ্যাত্মিক জীবনের সহায় হয় তবে, উহাদের উপযোগিতা আছে বলিতে হয়। প্রাণশূন্য, আন্তরিকতাহীন হইলে উহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে উৎপাটন করিয়া ফেলা উচিত। বল, ভক্তিলাভের আর একটী সাধন। শ্রুতি বলেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" (মুণ্ডকোপনিষদ ৩। ২ ৪ বলহীন ব্যক্তি তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআদ্যনাথ বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ।

প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অপিযদিবিশিখাঃ শরাসনং বা কুসুমময়ং সসুরাসুরং তথাপি
মমজগদখিলং বরোরুনাজ্ঞামিদমতিলঙ্ঘ্যধৃতিং মুহূর্ত্তমেতি

তথাহি।

অহল্যায়াজারঃ সুরপতিরভূদাত্মতনয়াং
প্রজানাথোঽযাসীদভজত গুরোরিন্দুরবলাং
ইতিপ্রায়ঃ কোবানপদমপদেঽকার্য্যতময়া
শ্রমোমদ্বাণানাং কইহ ভুবনোন্মাথবিধিষু

কাম। প্রিয়ে! তুমি স্ত্রীস্বভাবসুলভ বিবেক হ'তে কেন অকারণ ভয় কোরছ ?

যদিও কুসুমময় শরাসন মম
আর পুষ্পময় বাণ, অতি সুকোমল।
মম আজ্ঞা লঙ্ঘি হায়! তথাপি বরোরু।
মুহূর্ত্ত না পারে ধৈর্য্য করিতে ধারণ
সুরাসুর নর কিম্বা অখিল জগৎ।
আমার অধীনে কেবা বিপথে গমন
না করেছে সুবদনা? কর নিরীক্ষণ—
আমার ইঙ্গিতে দেখ সুরপতি হায়!
হইল অহল্যাজার, ব্রহ্মা কন্যাগামী,
গুরুপত্নী হরি চন্দ্র জগতে কলঙ্কী।
মথিলেও ত্রিভুবন বিশিখের মম
নাহি হয় বিন্দুমাত্র শ্রম চারুশীলে!

রতিঃ। অজ্জউত্ত! এবমেদং তথাবি মহাসহাঅসম্পণ্ণা সত্তিদবেবা অরাদি জদো অস্স জমনিঅমপ্পমুখা অমচ্চা সুনিঅন্তি। *

রতি। আপনি যা বল্লেন সবই সত্য, কিন্তু সামান্য শত্রু ও যদি প্রবল সহায়-সম্পন্ন হয়, তা হ'লে তাকে ভয় ক'রে চ'ল্‌'তে হয়। আমি শুনেছি এর যম নিয়ম প্রমুখ—কতকগুলি অমাত্য আছে, তাহারা বড়ই দুর্জ্জয়, তাই প্রাণে ভয় হয়।

কামঃ। প্রিয়ে! যানেতান্ রাজ্ঞোবিবেকস্যবলবতো যমাদীনস্টৌ তাবদমাত্যান্ পশ্যসি ত এতে নিয়তমস্মাভিরভিযুক্ত মাত্রাগ্রাগেব বিঘটিষ্যন্তে।

তথাহি,—অহিংসাকৈবকোপস্য ব্রহ্মচর্য্যাদয়োমম
লোভস্যপুরতঃকেহমীসত্যাস্তেয়াপরিগ্রহাঃ

কাম। প্রিয়ে! মহারাজ বিবেকের যমনিয়ম প্রভৃতি যে বলবান্ আটটি অমাত্য দেখছ, তুমি নিশ্চয় জেন—আমরা উহাদের সম্মুখীন হ'তে না হ'তেই উহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন কোর্‌বে——

ব্রহ্মচর্য্য আদিকরি সকাশে আমার,
অহিংসা কোপের কাছে, লোভ কাছে আর

* আর্য্যপুত্র! এবমেবৈতৎ তথাপি মহাসহায়সম্পন্নঃ শক্তিতব্যোহরাতিঃ যতোহস্য যমনিয়মপ্রমুখা অমাত্যাঃ শ্রূয়ন্তে ইতি সং

সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহ ত্যাজি প্রাণভয়
পারিবে দাড়াতে বল কতক্ষণ হায় !

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার-ধ্যানধারণাসমাধয়স্তু নির্ব্বিকারচিত্তে সাধ্যত্বাদীষৎকরসমুন্মূলনা এব অপিচ স্ত্রিয়এবামীষাংকৃত্যা স্তেনতেঽস্মদ্গোচরা এব বর্ত্তন্তেযতঃ ;—নন্বিবিলোকনভাষণ-বিলাসপরিহাসকেলি-পরিরম্ভাঃ। স্মরণমপি কামিনীনামলমিহ মনসো বিকারায়। বিশেষতশ্চৈতে মদমান-মাৎসর্য্যদম্ভলোভা-দিভিরস্মৎস্বামিবল্লভৈরভিযুজ্যমানা নরপতিমন্ত্রিণমধর্ম্মমেবাশ্রয়িষ্যন্তি।

আরও দেখ যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যানধারণা-সমাধি এ সকলই একমাত্র নির্ব্বিকারচিত্তসাধ্য, সুতরাং ইহাদের উচ্ছেদসাধন আমাদের পক্ষে অতি সামান্য কাজ, কেন না রমণীই ইহাদের একমাত্র মারণাস্ত্র, সুতরাং উহারাত আমাদের মুষ্টির মধ্যেই রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের দর্শন সম্ভাষণ বিলাস পরিহার কেলি আলিঙ্গন দূরে থাক, উহাদের স্মরণও চিত্তবিকার জন্মাইতে যথেষ্ট সক্ষম, তবুও যদি কেহ ওপথে যায় সে-ও মদমান মাৎসর্য্য দম্ভলোভ প্রভৃতি আমাদের মহারাজের প্রিয়মোসাহেবগণের পরামর্শে চালিত হ'য়ে রাজমন্ত্রী অধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করবে।

রতিঃ। অজ্জউত্ত ! সুদং মএ তুহ্মাণং সমদমপ্পহুদীণং অ একং উপ্পত্তিটঠাণংত্তি। *

রতি। আর্য্যপুত্র ! আমি শুনেছি তোমাদের ও শমদম প্রভৃতির নাকি একই উৎপত্তিস্থান ?

কামঃ। প্রিয়ে কিমুচ্যতে একমুৎপত্তিস্থানমিতি নমুজনক এবাস্মাক-মভিন্নঃ। তথাহি ;—

সম্ভূতঃ প্রথমমিহেশ্বরস্য সঙ্গা-
স্ময়ায়াং মনইতি বিশ্রুতস্তনূজঃ
ত্রৈলোক্যং সকলমিদং বিসৃজ্যতেন
স্তেনাথোজনিত মিদং কুলদ্বয়ংনঃ
তস্যপ্রবৃত্তি নিবৃত্তীদ্বেধর্ম্মপত্ন্যৌ তয়োঃ
প্রবৃত্ত্যামুৎপন্নং মহামোহপ্রধানমেকং কুলং
নিবৃত্ত্যা মুৎপন্নং দ্বিতীয়ং বিবেকপ্রধানমিতি

কাম। প্রিয়ে ! আমাদের উৎপত্তিস্থান এক, এ আবার তুমি কি বলছ ! আমাদের পিতাই এক।

---

* আর্য্যপুত্র ! শ্রুতংময়া যুষ্মকং শমদম প্রভৃতীনাঞ্চ একমুৎপত্তিস্থানমিতি ইতি সং।

ঈশ্বর ঔরসে হায় মায়ার গর্ভেতে।
মন নামে পুত্র জন্মে সৃষ্টির আদিতে॥
মাতা পুত্রে সৃজি অগ্রে এবিশ্ব সংসার।
সৃজিলেন কুলদ্বয় মোদের আবার॥

সেই মনের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামে দুটী ধর্ম্মপত্নী, তার মধ্যে প্রবৃত্তির গর্ভে মহামোহ প্রধান এক কুলউৎপন্ন হয় ও নিবৃত্তির গর্ভে বিবেকপ্রধান এক কুল উৎপন্ন হয়।

রতিঃ। অজ্জউত্ত! জই এবং তাকিংত্তিসোঅরাণং তুহ্মাণং এ আরিসং বৈরং। *

রতি। আর্য্যপুত্র! যদি ইহাই সত্য হয়, তবে তোমাদের ভায়ে ভায়ে এরূপ বৈরিতা কেন?

কামঃ। প্রিয়ে! একামিষপ্রভবমেব সহোদরাণা
মুজ্জৃম্ভতে জগতি বৈরমিতি প্রসিদ্ধং
পৃথ্বীনিমিত্তমভবৎ কুরুপাণ্ডবানাং
তীব্রস্তথাহিভুবনক্ষয়কৃদ্বিরোধঃ

সর্ব্বমেবচৈতজ্জগদস্মাকং পিত্রুপার্জ্জিতং তচ্চাস্মাভিস্তাত প্রিয়তয়া সর্ব্বমেবাক্রান্তং।

তেষাম্বিরলপ্রচারঃ তেনতে পাপাঃ
পিতর মস্মাংশ্চ সমূলমুন্মূলয়িতুমুদ্যতাঃ

কাম। প্রিয়ে! একামিষলোভী যদি হয় দুই জন,
সহোদর মধ্যে বৈর করে সে স্বজন॥
হয়েছিল এ কারণে বিশ্ববিনাশন
দ্বাপর যুগেতে কুরুপাণ্ডবেতে রণ॥

দেখ এই সারাজগৎটাই আমাদের পিতার উপার্জ্জিত আমরাই পিতার প্রিয়-পুত্র, তাই প্রায় সমগ্র রাজ্যই আমরা দখল কোরে ব'সেছি, তাদের দখলে অতি সামান্য স্থানই আছে। তাই সেই পাপাত্মারা পিতাকে ও আমাদিগকে উন্মূলিত ক'রবার উদ্‌যোগ ক'রছে।

রতিঃ। (কর্ণৌপিধায়) সন্তং পাবং অজ্জউত্ত! কিং এদং পাবং বিদ্দেশমত্তকেণজ্জেব তেহিং আবদ্ধং অধবা তোহু এথ কোউপাত্তমস্তি দাবেবা? †

---

* আর্য্যপুত্র! যদেবং তৎকথং সোদরাণাং যুষ্মাকং ঈদৃশং বৈরং (ছায়া সং)

† শান্তং পাপং আর্য্যপুত্র! কিমেতৎপাপং বিদ্বেষমাত্রেণৈবতৈরাবদ্ধং ভবতুঅথবা অত্র ক উপায়ো মন্ত্রয়িতব্যঃ। (ইতি সং)

রতি। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) অশ্রাব্য। অশ্রাব্য। আর্য্যপুত্র। কেবল-মাত্র বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হ'য়েই কি ইহারা এই মহাপাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'য়েছে? অথবা যা'কৃ সে কথা, এখন এ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন, করা যায়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

পদাধিকার। রায় শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বাহাদুর পোষ্টাফিসের ডেপুটী-ডিরেক্টর জেনারল হইয়াছেন। এ পদে এ পর্য্যন্ত কোনও ভারতবাসীর অধিকারে আসে নাই, এই প্রথম। "শনৈ পর্ব্বত লঙ্ঘনং"—নীতির এটীও একটী প্রয়োগ বটে।

আবৃত্তি পরীক্ষা। সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আবৃত্তি পরীক্ষার ফল অনুসারে দুই দফা পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব কলিকাতা সংস্কৃত পরীক্ষা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। পুরস্কার দিবেন—কাশীমবাজারাধিপতি মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়। সংস্কৃত পরীক্ষাসমিতির সভাপতি মহাশয় এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। স্মৃতি-শক্তির উদ্বোধনে এই পুরস্কার ব্যবস্থা যথেষ্ট সাহায্য করিবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। "ফলেন পরিচিয়তে।"

কৃতিত্বের কথা। মাদ্রাজের কে, পি, শিবশঙ্কর আয়ার এবার সিভিল-সার্ভিস্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কৃতিত্ব সন্দেহ নাই।

সৎকর্ম্ম। সিমুলিয়ার শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মধ্যপ্রদেশে পার্ব্বত্যপ্রদেশে পেন্দ্রারোড় মালভূমির উত্তরে যক্ষ্মারোগগ্রস্তগণের জন্য স্বকার্য্যে একটী স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর যক্ষ্মারোগীই সেখানে স্থান পাইবে। এতাদৃশ সৎকর্ম্মকারী প্রকৃতই প্রশংসার্হ। ভগবান্ সৎকর্ম্মকারীকে দীর্ঘজীবী করুন।

III.

CO-OPERATION AND NON-CO-OPERATION. QUESTIONS & ANSWERS.

(Continued)

Even if people would everywhere give up District Board and Municipal memberships, Municipalities and District Boards will be managed by District Magistrates as before through paid officers. If jurors refuse to work, the judges will decide cases themselves as before. If Hony. Magistrates resign their offices, more salaried officers will be needed. If Presidents of Punchayet do not do their work, Sub-Inspectors of Police will as before take it up. If Union Boards cease, things will go on as before, but the villages will remain uncared for ; and the work of education and sanitation being left in the hands of central authorities will suffer. So this measure is not likely to paralyse the Govt. Eeven if it be assumed that the agitation will be able to induce people to give up all honorary offices the Govt. will not be put to any serious difficulty ; For there is absolutely no likelihood that salaried officers will join the movement, and Mahatma Gandhi's programme perhaps does not iuclude it. Even after constant preaching of non-co-operation for about a year it is doubtful whether even half a dozen Govt. offiicers have given up their offices.

[4] Next as regards the boycott of educational Institution :—

Education is now a transferred subject and the people can now, if they think the present system of education to be defective, change it in any way they like. There is no doubt that there should be more vocational schools in the country. But one can open as many institutions of such character without adoptiong the programme of Non-co-operation. If we want to have more technical schools, let us have them by all means ; but I do not really understand why the existing schools should be destroyed. Only 5 or 6 per cent of the people of India are literate. If the total number of existing educational institutions be represented by 1, there 16 more institutions are needed for the education of our people. If one has an eye to the spread of education, literary and technical, then there is ample room for him to start more primary and secondary high schools without breaking up the existing ones. If the education that is imparted in them proves to be superior to what is given in

the existing institutions, the latter will have to be remodelled after them or they will cease to exist. There was a time when there were no such institutions in this country. Even all of the students desert the existing institutions, the Govt. will go on as before.

But I forget. I understand that the attempt to make the students leave the schools is not really to give them better education, but to turn them into Non-co-operation preachers for the attainment of Swaraj. It has been declared times without number that there boys are to be utilised for preaching Non-co-operation in the villages. It has been also said that India should be cosidered in a state of war, and so when a country is fighting for its independence, education is not of primary importance. These boys are to enlist themselves as soldiers in the Non-co-operation campaign. The boys of our country and their guardians, though they have shown a little weakness at times, have on the whole stood firm and resisted the seductive charms of Non-Co-operation ; and schools and Colleges are getting on as before. No doubt a few boys, some emotional and wellmeaning and other unpromising having little chance of success in their educational career, have left their Schools and Colleges and joined the Non-Co-operation movement and are being utilised as non-co-operation-preachers.

They have proved too strong for their parents, who in this country I regret to say, do not always care to exercise that control over their boys which should be done for their own good. The last Swadeshi movement failed throngh the excesses committed by such misguided youths. And I am afraid if this agitation is kept up, there will be again a repitition of the scenes which we all now deplore. So the boycott of schools and Colleges is not sufficient to paralyse the Govt. These undisciplined boys are doing lots of meschief and Mahatma Gandhi himself had to condemn their excesses more than once.

Q. Is not Mahatma Gandhi really a noblehearted man ? And how is it that he is advocating this policy of breaking up schools and Colleges, if it is harmful to the interests of India ?

A. Though my personal acquaintance with Mahatma Gandhi is of a very slight character yet from what I have seen and heard of him. I have no doubt about the nobility of his character. But a good or noble heart is not always a guarantee for sound judgment. He himself perhaps does not claim infallibility for himself though some of his followers claim it for him. It pains me to think that such a salutly character should take into his head the idea of the breaking up of the educational institutions of this country. You

know Pandit Madan Mohan Malaviya and he is as selfless as Mahatma Gandhi, Long before the Non co-operation movement, he had given up a lucrative practice in the Allahabad High Court and had travelled all over country with a begging bowl and devoted himself to the establishment of the Benares Hindu University, which is an unique institution. If our aim is to conserve what is best in our own culture and at the same time assimilate what is best in the west. you cannot devise a better institution than the Benares Hindu University. It is a selfgoverning institution. Even the Chanceller is an Indian. Its only connection with the Govt is that it receives an aid from the Govt. Even when complete Swaraj is attained you cannot conceive of establishing a better institution than the Benares Hindu University. I cannot reconcile the saintliness of Mr, Gandhi's character with his attempt to break up this institution except on the supposition that his vision has been clouded by his overpowering passion for the success of the movement of which he is the apostle.

Q. If he is of opinion that everything that comes through the hands of the Govt. is unclean, is he not consistent in refusing to have any thing to do with an institution which is aided by Govt, and has got its charter from it?

A. Even in such a case I cannot call him consistent. The Money that is received by the Hindu University is our own money. If the very fact of its passing through the hands of the Govt is objectionable, then how is it possible for him to aim at Swaraj within the British Empire? For he has clearly said that he is not against responsible Govt. within the Empire, If he can take advantage of railways, post offices telegraphic wires and newspapers which are all registered by Govt, how is it consistent for him to attempt to destroy the educational institutions which he himself would likely be the first to establish if he gets Swaraj, simply because it receives money contributions from the Govt.

(5) Suspension of practice by lawyers, Even if lawyers suspend their practice, courts will go on all the same and judges will decide cases by hearing the parties without their help. Justice may suffer now and then; but it suffers even now, lawyers notwithstanding. In no court of law in any country are judges infallible and mistakes are committed even by good and honest judges, It may entail a little hard work on the judges but it may also shorten their work, for they will not have to hear long arguments and cross examinations. Nobody is compelled to seek the protection of law courts and the institution of lawyers is an outcome of the British Govt, There

no doubt more lawyers than necessary but as the prospects are becomm ing less and less bright our educated men are taking to other avenues of life. Lawyers exist because there is litigation. There are lawyers even in the freest of countries. The profession is an independent and honourable one, though Mahatma Gandhi has painted it in the darkest of colours. He was himself a lawyer for a considerable time and he is not ashamed of his achievements as a lawyer. Lawyers in every civilised country are sturdy champions of liberty and have frequently stood between the oppressor and the oppressed. Most of the greatest statesmen of the world are lawyers. There are good and bad men in the legal profession as in every other walk of life. The study of law gives a logical training to the mind which enables one to decide promplty between right and wrong. A sound lawyer never takes to quibbling which is often quoted as derogatory to the profession. Inordinately credulous as the masses of this country are and ready to swallow, as they do, exparte and hearsay statements, the training of a lawyer is a guarantee against such a frame of mind. Lawyers are intelligent enough to know what is what and up to this time, I believe, not even a dozen pleaders of established practice have adopted Mahatma Gandhi's programme. Just as there are emotional boys so there are some emotional lawyers and just as there are failures among boys so there are failures among lawyers and Non-co-operation may succeed with them. There are also some sincere and able men whose regard for Mahatma Gandhi might have induced them for the time being to adopt the course as an experiment which in cooler moments they will come to consider utterly futile for the attaiment of Swaraj. The experience of the last six months has clearly shown that lawyers as a body have a sturdy common sense which refuses to yield to the dictum of any one howsoever high his position and noble his character may be. Some of those Non co-operating lawyers may be utilised as preachers, honourary or salaried, and this preaching may succeed to excite the masses especially at a time when prices have gone high and create in their minds a prejudice against the Govt. This may lead to agrarian riots and anarchy, but it will not achieve the end in view.

(6) Arbitration Courts.

Q. If people settle their disputes by arbitration and do not resort to the lawcourts that will be boycotting the lawcourts and is not the boycott of lawcourts an effective weapon ?

A The British Govt, does not compel any body to come to British Courts. People can always settle their disputes by arbitration. Suppose two persons dispute over a plot of land each claiming it as his own ; and one of them eventually succeeds to get possession of it. The dispossessed party comes to the civil court and the matter is ultimately decided by a decree of the court. The winning party gets the land by virtue of that decree. Here there is the sanction of the law and the winning party is maintained in possession by the State by virtue of the decree. They may also go to arbitration and have the dispute settled by an award of one or more arbitrators. The award may be filed in court under the provisions of the Civil Procedure code and a decree obtained from it on its basis and the result is the same as before. But if there is no decree of the court on the basis of the award there is nothing to prevent the winning party from being dispossessed again. So in every case you are in need of a power to enforce justice. You cannot conceive of any people in any country where there will be total absence of rival claims. They have law courts in free countries also and we must have our lawcourts even when we get Swaraj It is inconceivable that for a whole year the people will suffer civil wrongs without any redress. Arbitrators have no powers to enforce their awards. Human beings are not angels and they must have differences and these differences must be settled and peace preserved by the ultimate authority of some Govt. or we shall revert to a state of nature. Even at present criminal cases not of a serious nature can be compounded. But the perpetrators of serious offences such as robbery, murder etc. must be punished for the preservation of society. Life, liberty and property will be unsafe if there are no courts. Even if you can imagine that people may be made to abstain from law courts, still the Govt. will not be paralysed. It will only lose the revenue but it will be easily recoupeds from other sources If jails are taken into account along with criminal courts, then they are more a spending than an earning Deptt. Litigation especially in some parts of India has no doubt become an evil and every one deplores it. The Government has however never been against the settlement of disputes by arbitration.

In the year 1893 I wrote an article in my journal The Hindu Patrika and since then I have been always doing my humble best to have disputes settled by arbitration within the small sphere of my humble influence.

The following rules were framed for the formation of Arbitration courts.

Litigation and Arbitration Courts.

Litigation—a disease.

"Litigation has assumed the form of a disease in this country. We do not clearly comprehend that this selfimposed disease is working out our ruin. For the number of suits would be going up every year. Litigation has become a habit with us. A drunkard knows the evil effects of drinking, but yet he cannot give up the habit, so is also the litigant in many instances."

Loss of money.

Of the evils of litigation, the first is the loss of money. The end of litigation is not always gained even if one wins. You file a suit for the possession of one bigha of land. The money that is spent in the first court of law, leaving the expenditure in the two higher courts of appeal out of account, is enongh to buy more bighas of land than one. The other gains are loss of time, injury mental and physical, worry, various indignities in court, increase of hostility with the other party and laying the foundations of fresh litigation in future. Even in big suits the gain is more than counterbalanced by the fees paid to lawyers. Many prosperous families of our country have been utterly reduced to poverty by litigation.

Litigation when prompted by motives of revenge rather than of gain is like as the Bengali adage goes, cutting ones own nose to make the enemy's journey inauspicious.

The ways of the wicked.

Most of my readers are perhaps aware of the story of a wicked Brahmin. A poor but wicked Brahmin prayed for a boon from Mahadeva that he might get whatever he prayed for. But Mahadeva granted the boon but limited it to three occasions and further said that his neighbours would get twice as much every time. The first and second time the brahmin asked for various useful articles and got them; but his neighbours each time got double of what he got. That was too much for the wicked man. And he prayed, 'Let one of my eyes be blinded.' He lost one eye, his neighbours however lost both their eyes. He was right glad; and he robbed his neighbours of all their wealth and possessions.

After a few days a gang of robbers fell upon the Brahmin's house. He ran to his neighbours' houses for aid, but being blind, they could do nothing to help him. It was then that the Brahmins saw his folly and realised the truth that in doing harm to others one harms himself. Litigation however is often necessary. When the

strong oppress the weak, what can the latter do but to seek the protection of law? The right party however does not always win, some times it all depends upon chance and if all civil suits are settled by arbitration, according to our old custom, there will be less perjury & less waste of money and the possibility of fresh litigation will be minimised. Arbitrators should be honest & intelligent and of the locality who know the parties and witnesses well.

Arbitration courts.

It should be clearly explained to villagers how litigation is doing great harm to them. It should be pointed out that all classes of people the tenants the landlords, the debtors and the creditors are alike suffering by litigation and that it would be a relief to all of them if disputes are setteld by arbitration. Again if it is once penited out to the people that it is an illusion to expect a fair settlement by the justice administered in the lawcourts through various intricate laws and false depositions on both sides, then they will no more have any appetite for litigation and shun it like the proverbial "laddu of Delhi." People will fly to arbitration courts whenever they are wronged, if they once come to know that such courts exist and that they may hope for better justice in them than in the law courts. Wicked litigants may seek justice in the law courts thinking that their ends would not be accomplished by the judgment of the arbitration courts ; but if men's minds might be inspired with a burning sense of hatred for false litigation and false evidence then even these people would resort to arbitration courts for fear of social humiliation. But it is said that such arbitration will meet with

Opposition from lawyers,

as it will entail loss to them. Those who have such misgivings in their minds should know that lawyers exist because there is litigation and not that litigation exists on account of lawyers. If litigation goes on decreasing, educated men will gradually take to other walks of life and not turn to law. It is very uncharitable to think that lawyers deire to see their country runied through litigation though it may be to their own advantage. Physicians are necessay when there is a disease. But they cannot be said to be its cause. So I cannot believe that lawyers will put any obstacle in the way of disputes being settled by arbitration. There are others who think that.

Government will oppose it.

Those who entertain such uncharitable feelings against the Govt should disabuse their minds of it. No Govt. can have any desire to ruin the people for the sake of increasing its revenue from court-fees. There have been not wanting instances where high officials had made proposals from time to time for reducing litigation. Taxes on litigation are levied for defraying costs of the administration of justice. And the balance after deducting the expenses from the receipts goes towards the defraying of expenses of other departments. The lesser the litigation, the lesser the revenue but it can be recouped in other ways.

The Constitution of Arbitration Courts.

It may be thought that it would be impossible to settle by arbitration the disputes of a single district not to speak of the whole of India. A little reflection will show that it is quite feasible. At present the administration of justice has been centralised in district and subdivisonal headquarters. But if arbitration courts are established for groups of villages, the work of the arbitration courts will be very light. No initial expenditure is necessary for the establishment of arbitration courts ; all that is necessary is a little organisation. If a few educated and patriotic men in every district make it a point to establish arbitration courts they can do it very easily. It will not do simply to weep over the sorrows of the country. We must make determined efforts for removing them Keep the examples of the ancient sages of this country steadily before your eyes; remember how they used to teach people and treat patients without fees in ancient days, and how they used to administer justice in the law-courts without salaries. Patriotism is not dead in this country ; only a little organisation is needed. Remember the wellknown lines of the Gita.

"You have a right to do your duty but not to the fruits thereof."

(Continued.)